মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সমীপে খোলা চিঠি

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ ঃ ২৫ মার্চ, ২০১৬

শ্রদ্ধেয় মহাশয়া,

রাজ্য প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের বৃহত্তম সংগঠন (যদিও আপনি ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়নি) হিসেবে প্রশাসনের সর্বোচ্চ কার্যকরী পদাধিকারিকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন আমাদের কর্তব্য এবং পত্রের শুরুতেই সেই কাজটা আমরা সেরে রাখছি। আমরা জানি আপনি নির্বাচনী প্রচারের চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন। আপনার নিজস্ব নির্বাচনী কেন্দ্র (ভবানীপুর) ছাড়াও প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রেই দলের 'সুপ্রিমো' হিসেবে আপনাকে ছুটে যেতে হবে। প্রতিটি নির্বাচনেই এইরূপ ব্যস্ততা আপনার থাকে, কিন্তু এবার ব্যস্ততা সম্ভবত আরও বেশী। কারণ নির্বাচনের মুখে এসে নারদ নিউজের স্টিং অপারেশনে আপনার দলের কয়েকজন তাবড়-তাবড় নেতা-নেত্রীর দুর্নীতির কুশ্রী 'জাঁতাকলে' (শব্দটা আপনার থেকে ধার করলাম) জড়িয়ে পড়ার ঘটনা জনসমক্ষে চলে আসায়, আপনাকে 'ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট'-এ নামতে হয়েছে। আপনি নিজেই কোন এক জায়গায় নির্বাচনী প্রচারে বলেছেন (সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত) ২৯৪টি কেন্দ্রে আসলে আপনিই প্রার্থী। যদিও আপনার কাছেও মানুষের প্রশ্ন রয়েছে। আপনার দলের বড়-মেজ-সেজ কোন নেতা-নেত্রীই আপনার অনুমতি ছাড়া এক গ্লাস জলও সম্ভবত খেতে পারেন না, সেখানে 'সারদা থেকে নারদা' এতকান্ড আপনার অগোচরে ঘটে গেছে, তা মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না। তবে তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। আমাদের এই খোলা চিঠির অবতারণা এই কারণে নয়।

এই ব্যস্ততার সময়ে আপনাকে বিরক্ত করার কোন আগাম অভিপ্রায় আমাদের ছিল না। কিন্তু আপনার নির্বাচনী ইস্তাহারের ৩ নং পাতায় এমন কয়েকটি লাইন আমাদের চোখে পড়ল, যা দেখে প্রত্যুত্তরে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন বলেই মনে হয়েছে। আপনি লিখেছেন, সি পি এম সরকার (যা আসলে বামফ্রন্ট সরকার। আপনার হয়ত বা বুঝতে অসুবিধা হয়েছে, কারণ জোটধর্ম পালন আপনার ধাতে নেই তা আমরা জানি) রাজ্য প্রশাসনে কাজ না করার পাকাপাকি ব্যবস্থা করার জন্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি নামক বিশ্রী জাঁতাকলটি ব্যবহার করেছিল। আমাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন সম্পর্কে আপনার এই মূল্যায়ন (বিশ্রী জাঁতাকল)-এর ভিত্তি কি তা আমারা জানতে আগ্রহী। কারণ আপনার আগে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে আরও অনেকেই বসেছেন। তাঁরা সকলেই আমাদের খুব পছন্দ করতেন, তাও নয়। কিন্তু কেউই এই ধরনের মন্তব্য করেননি।

আপনার কথিত সিপিএম সরকার কাজ করেছে কি করেনি, সাধারণভাবে তার জবাব দেবার দায়িত্ব বামফ্রন্টভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলির। আমাদের নয়। কিন্তু যেহেতু কাজ না করার সাথে আমাদের সংগঠনের নামটাও আপনি জুড়ে দিয়েছেন, তাই দু-এক কথায় এর জবাবতো দিতেই হয়।

আচ্ছা বলুনতো, ভূমি সংস্কার, বর্গা রেকর্ড, পাট্টা ও যৌথ পাট্টা প্রদান—যা সারা দেশে নজির সৃষ্টি করেছিল শুধু তাই নয়, বিশ্বব্যাঙ্কের ২০০৬ সালের ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টেও যার প্রশংসা করা হয়েছিল, তা কি কাজ না করার নমুনা? প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মচারীদের (আপনার কথা অনুযায়ী কো-অর্ডিনেশন কমিটি) ভূমিকা পালন ব্যতিরেকে এই সাফল্য অর্জন কি সম্ভব ছিল?

আচ্ছা বলুনতো, ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, যা এ রাজ্যে 'সিপিএম' সরকার গড়ে তুলেছিল, তা কি কাজ না করার নমুনা? প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীতো পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকেই সারা দেশের জন্য মডেল হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন (১৯৮৮)। আপনিতো তখন সাংসদ, রাজীব গান্ধীর দলেই ছিলেন। মনে নেই? এই ব্যবস্থা গড়ে ওঠা, কার্যকরী ভূমিকা পালন কি পঞ্চায়েত স্তরের কর্মচারীদের (যাঁরাও কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাথেই আছেন) ছাড়া সম্ভব ছিল? স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের দিকে চোখ রাখুন। ১৯৭৭ সালে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৩২৬। ২০১০ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১২,০০০। এও কি কাজ না করার নমুনা? আচ্ছা ঐ ১২ হাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্র চলল কি করে, যদি না স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীরা ভূমিকা পালন করতেন? সামাজিক বনসৃজনে 'সিপিএম' সরকার একাধিকবার পুরস্কৃত হয়েছে। কাজ না করার নমুনা? বন দপ্তরের কর্মচারীদের ভূমিকা ছাড়া বনসৃজনের কাজে সাফল্য আসত? এমন আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু আপনার মূল্যবান সময় আমরা নষ্ট করব না।

আচ্ছা, 'সিপিএম' সরকারের কথা ছেড়েই দিলাম। আপনি আপনার ইস্তাহারে প্রবল উন্নয়নের যে ঢাক পিটিয়েছেন (তা সত্যি কিনা মানুষ বিচার করবেন), তা যদি তর্কের খাতিরে সঠিক বলেও ধরে নিই, তাহলে কর্মচারীদের ভূমিকা ছাড়া এত উন্নয়ন হল কি করে? কর্মচারীদের সিংহভাগই তো কো-অর্ডিনেশনের সদস্য। আপনি কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে বিশ্রী জাঁতাকল বলতে গিয়ে একথাও বলেছেন যে, প্রথম দু'বছর শুধু ফাইল খুঁজতে চলে গিয়েছে। আপনি কার্যত কাজ করার সময় পেয়েছেন ২৫ থেকে ৩০ মাস। আমাদের বিনম্র প্রশ্ন, তাই যদি হবে, তাহলে আপনার সরকারের ১০০ দিন পূর্তি অনুষ্ঠানে বললেন কি করে যে ৯০ শতাংশ কাজ করে ফেলেছেন? ১০০ দিন মানে তো তিন মাসের একটু বেশী মাত্র। তাহলে হয় তখন মিথ্যে বলেছিলেন, না হয় এখন বলছেন! অবশ্য মিথ্যা বলা, অসত্য প্রচার করা, আপনার স্বভাবগত তা রাজ্যের মানুষ জানেন।

সব শেষে বলি, কো-অর্ডিনেশন হোক আর ফেডারেশন। সবাই রাজ্য সরকারী কর্মচারী। যে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কোন দাবি গত পাঁচ বছরে মানলেন না, উল্টে বিভিন্ন আক্রমণ নামিয়ে আনলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সমালোচনা করার, বিদ্রুপ করার কোন নৈতিক অধিকার কি আপনার আছে? এত বঞ্চনা সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলার কর্মচারীরা তাঁদের ভূমিকা পালন করছেন, কারণ তাঁরা জানেন তাঁরা কাজ করেন জনগণের জন্য, কোন সিপিএম বা তৃণমূল সরকারের জন্য নয়। ইতিহাস সম্পর্কে আপনার কেমন বিপুল জ্ঞান রয়েছে, তা আমরা জানি, তবুও মনে করিয়ে দিই, গত শতাব্দীর ষাটের দশকে কো-অর্ডিনেশন কমিটিই আওয়াজ তুলেছিল, রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা জনগণের সেবক, সরকারের গোলাম নয়।

আসলে আমরা বুঝি কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতি আপনার বিষোদগার আসলে হতাশার অভিব্যক্তি। প্রশাসনের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরেও কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভাঙ্গা তো দূরের কথা দুর্বলও করতে পারলেন না যে। আপনি শুনলে খুশি হবেন, না ক্ষিপ্ত হবেন জানি না, তবু জানিয়ে রাখি কো-অর্ডিনেশন কমিটির পাশে আজ আরও ৩৪-৩৫টি সংগঠন এসে দাঁড়িয়েছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, আপনি কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে জাঁতাকল বলুন আর যাই বলুন, পাঁচ বছরের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে আপনার প্রশাসনিক গিলোটিন কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাংগঠনিক ইমারতের এক টুকরো ইটও খসাতে পারেনি।

এবার আপনি তৈরী থাকুন মানুষের জবাবের জন্য।

শ্রদ্ধান্তে,
ভবদীয়
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

ভারতী মুৎসুদ্দি

টুম্পা কয়াল

মৌসুমী কয়াল

সুতপা হাজরা

কৃষ্ণা বসু

শিখা মুখার্জী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে ১০৬তম আর্ন্তজাতিক নারী দিবস মৌলালী যুবকেন্দ্রে অত্যন্ত উদ্দীপনা ও সাফল্যের সঙ্গে ৮ মার্চ, ২০১৬ পালিত হল। বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই বছর 'নয়া উদারনীতি ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও নারীদের অধিকার রক্ষায় পরিস্থিতির পরিবর্তনের সংগ্রাম' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও নারী আন্দোলনের অগ্রণী নেত্রী ভারতী মুৎসুদ্দি। এছাড়া এই সভায় সংবর্ধনা জানানো হয় কামদুনির ঘটনার দুই বিশিষ্ট প্রতিবাদী মুখ ও 'আক্রান্ত আমরা'র সদস্য মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়ালকে। সভার শুরুতেই গণসঙ্গীত পরিবেশন করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অশোক পাত্র। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ-সভানেত্রী কৃষ্ণা বসু। উক্ত অতিথিবৃন্দ ছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম সহ-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, সভাপতি অশোক পাত্র ও কেন্দ্রীয় মহিলা উপসমিতির যুগ্ম

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

আহ্বায়িকাদ্বয় শিখা মুখার্জী ও সুতপা হাজরা। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী ও মহিলা উপসমিতির পক্ষে সুতপা হাজরা। পুষ্প স্তবক ও 'নারী চরিতাভিধান' পুস্তক দিয়ে তিনজন অতিথিকেই সংবর্ধনা জানানো হয়। ভারতী মুৎসুদ্দিকে সংবর্ধনা জানান অশোক পাত্র, মৌসুমী কয়ালকে শিখা মুখার্জী ও টুম্পা কয়ালকে সুতপা হাজরা। সমগ্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিখা মুখার্জী। সভায় মৌসুমী ও টুম্পা কয়াল বলেন রাজ্যে নারীরা ভীষণভাবে আক্রান্ত। এই প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাদের বিভিন্নভাবে হুমকি ও নানা প্রলোভনের মুখে পড়তে হয়। কিন্তু সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে তারা এই প্রতিবাদ জারি রেখেছেন এবং আড়াই বছর পর হলেও অভিযুক্তরা শাস্তি পেয়েছেন। সভার মূল আলোচক শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি বলেন রাজ্যে চরম নৈরাজ্য চলছে। শাসক দলের প্রত্যক্ষ মদতে দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। কামদুনি তার একটি প্রমাণ। তিনি বলেন এই সরকারের আগেও রাজ্যে নারীদের প্রতি অত্যাচার হয়েছে কখনও কখনও কিন্তু সরকার তৎক্ষণাৎ অপরাধীদের ধরে কঠিন সাজার ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু বর্তমানে অপরাধীরা সহজে ধরা পড়ছে না। সরকার উল্টে নির্যাতিত নারীদের বয়সভেদে মূল্য নির্ধারণ করেছেন যা খুবই লজ্জার। কিছু প্রতিবাদী মানুষ এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন বলে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেই এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। □

অতীতের পাতা থেকে..

১৪ মার্চ, ২০০১ ঃ তহলকা

● **কি ঘটেছিল ঃ** ১৪ মার্চ, ২০০১, তৎকালীন বিজেপি-র জাতীয় সভাপতি বঙ্গারু লক্ষ্মণ এবং এন ডি এ শরিক সমতা পার্টির প্রধান ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজের ঘনিষ্ঠ জয়া জেটলির ওপর স্টিং অপারেশন পরিচালনা করে তহলকা। অপারেশন 'ওয়েস্ট এন্ড' নামে পরিচালিত এই স্টিং অপারেশনের ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় বঙ্গারু এবং জয়া জেটলি নগদ টাকায় ঘুষ নিচ্ছেন। জয়া জেটলির মুখে একথাও শোনা যায়, তিনি সাংবাদিকদের বলছেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সাথে অস্ত্র ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁকে আলাপ করিয়ে দেবেন।

● **অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে পরিচালিত এন ডি এ সরকারের প্রতিক্রিয়া ঃ** একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং অপরদিকে দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থকে বিঘ্নিত করার জন্য বিদ্বেষমূলক ষড়যন্ত্র।

● **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি করেছিলেন ঃ** তিনি ১৪ মার্চ সন্ধ্যায় এন ডি এ-র সভা বয়কট করেন এবং বলেন জর্জ ফার্নান্ডেজের ইস্তফা পত্র গৃহীত না হলে এন ডি এ ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর কাছে লেখা তিন পাতার চিঠিতে তিনি একটি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি অথবা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অথবা সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করার দাবি জানান। তাঁর দাবি না মানা হলে এন ডি এ-কে সমর্থন করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা ব্যতীত তাঁর কাছে আর কোনো রাস্তা খোলা থাকবে না।

● **সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলেছিলেন ঃ** এন ডি এ-কে সমর্থন করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যা সময় সাপেক্ষ। কিন্তু দুর্নীতির প্রসঙ্গে কোনোরকম সমঝোতা আমরা করবো না এবং আমাদের দাবি থেকে সরছি না।

● **পদত্যাগ ঃ** ১৫ মার্চ ২০০১, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৎকালীন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী অজিত পাঁজা পদত্যাগ করেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ৯ জন সাংসদ এন ডি এ থেকে বেড়িয়ে আসেন।

● **কেন ঃ** কারণ তার কিছুদিন পরেই ছিল পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন এন ডি এ-র সাথে থাকার মূল্য বিধানসভা ভোটে দিতে হতে পারে। তাই এন ডি এ থেকে বেরিয়ে এসে নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের সাথে জোট করেন। যদিও পরাজিত হন।

* * *

১৪ মার্চ, ২০১৬ ঃ নারদ

নারদ নিউজের স্টিং অপারেশনে দেখা গেল শাসকদলের মন্ত্রী, মেয়র, সাংসদরা প্রকাশ্যে ঘুষ নিচ্ছেন।

● **মুখ্যমন্ত্রী কি বললেন ঃ** আমরা সততার সাথে কাজ করি। আমাদের মতো সততার সাথে কাজ করে এমন কোনো রাজনৈতিক দল এদেশে নেই!!

● **দিন, তারিখ একই শুধু মাঝে বয়ে গেছে ১৫টা বছর।** □

সংগ্রামী হাতিয়ার
মার্চ ২০১৬
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৪তম বর্ষ □ একাদশ সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

তিমিরবিনাশী মানুষ জোট বাঁধো

গণতন্ত্র শব্দটির প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। গ্রীস দেশের নাগরিকরা ব্যবহার করেন প্রথম। এর ইংরাজী প্রতিশব্দ 'ডিমোক্রেসি', যার উদ্ভব ঘটেছে দুটি গ্রীক শব্দ ডিমোস (জনগণ) এবং ক্রেটোস (শাসন) থেকে। অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল জনগণের শাসন। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ গণতন্ত্রের এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন নি। যুগ যুগ ধরে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিয়ে কাটা ছেঁড়া করেছেন বিস্তর। বিতর্কও কম হয় নি। এখনও, পৃথিবী জুড়ে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রীতিমতো পরিণত বয়সে পৌঁছে যাবার পরেও, বিতর্ক একেবারে থেমে যায় নি। বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত, গুণীজন, বুদ্ধিজীবী যেমন গণতন্ত্রের উৎকর্ষতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য তাঁদের তথ্য ও যুক্তি সাজিয়েছেন, তেমনই এর সীমাবদ্ধতা ও অকার্যকারিতা নিয়ে সওয়াল করারও লোকের অভাব হয়নি কখনোই। শুধু সওয়াল করাই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকল্প 'একনায়কতান্ত্রিক' বা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাও হাজির করা হয়েছে। অবশ্য তার মানে এটা নয় যে, ইচ্ছেমতো পোশাক বদলের মতো রাষ্ট্রের শরীর থেকে গণতন্ত্রের পোশাক খুলে ফেলে, একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আধুনিক গণতন্ত্র তার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেমন একটি নির্দিষ্ট অর্থনীতিকে ভিত্তি করে উপরি কাঠামোর স্তরে আবির্ভূত হয়েছে, ঠিক তেমনই গণতন্ত্রের বিপ্রতীপ একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাবও ঘটে একটি বিশেষ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে।

ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলতে বোঝায় এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশিষ্ট মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী হ্যারল্ড ল্যাস্কির মতে গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। প্রায় অনুরূপ মত পোষণ করতেন ডঃ বি আর আম্বেদকরও। আমাদের সদ্য স্বাধীন দেশের সংবিধান প্রণয়ন উপলক্ষে গঠিত গণপরিষদের সর্বশেষ সভায় (২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯) ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, সংবিধান কার্যকরী করার মধ্য দিয়ে ভারতরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হল (এক ব্যক্তি, এক ভোট)। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে, রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা অর্থহীন হয়ে পড়বে।

'গণতন্ত্র' কথাটিকে আবার বহুক্ষেত্রে সংকীর্ণ অর্থেও ব্যবহার করা হয়। যেখানে গণতন্ত্র বলতে বোঝায় শুধুমাত্র রাষ্ট্র পরিচালনার স্বার্থে গঠিত একটি গণতান্ত্রিক সরকার বা ডিমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট। সঙ্কীর্ণ অর্থে গণতন্ত্রের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাটি নিরূপণ করেছেন আব্রাহাম লিঙ্কন—'গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিওপল্, বাই দ্য পিওপল্, ফর দ্য পিওপল'। গণতন্ত্রের সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞাটি সঙ্কীর্ণতর করে ফেলারও একটা প্রবণতা প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। তা হল, আনুষ্ঠানিক সর্বজনীন ভোটাধিকারই নাকি গণতন্ত্রের সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি। নিশ্চিতভাবেই প্রাপ্ত বয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকার গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট। কিন্তু এটিই একমাত্র বৈশিষ্ট বলে প্রচার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। রাজনৈতিক সাম্যের আচ্ছাদনের সাহায্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যকে আড়াল করার অপচেষ্টা। এই কাজটা মূলত করে থাকেন বুর্জোয়া সমাজ তাত্ত্বিকরা। কারণ ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য সোনার পাথরবাটির ন্যায়ই অবাস্তব। খোদ আব্রাহাম লিঙ্কনের দেশ গণতন্ত্রের পীঠস্থান রূপে অভিহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবী জুড়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঠিকাদারি নিয়ে রাখা এই দেশটিতে তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য তো রয়েছেই (অক্যুপাই ওয়ালস্ট্রীট ঃ উই আর নাইনটি নাইন পারসেন্ট, দে আর ওয়ান পার্সেন্ট), সামাজিক ক্ষেত্রেও সাদা চামড়া, বাদামি চামড়া ও কালো চামড়ার প্রভেদ এখনও ঘোচে নি।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া ব্যতিরেকে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক সাম্য নির্ভর গণতন্ত্র শুরু থেকেই দুর্বল এবং ভঙ্গুর। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য যে জনরোষ সৃষ্টি করে, তাকে বেশি দিন রাজনৈতিক সাম্যের বাক্সবন্দী করে রাখা যায় না। জনরোষের প্রবল চাপে রাজনৈতিক সাম্যের বাক্সে ফাটল ধরার আশঙ্কা থাকে যে কোনো মুহূর্তেই, আর শুরু থেকেই দুর্বল গণতন্ত্র দুর্বলতর হয়ে পড়ে।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে, বহু চর্চিত বুর্জোয়া গণতন্ত্র যখন বিপন্ন হয়, তখন দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের প্রবণতা জন্ম লাভ করতে পারে। একটি হল সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে উন্নততর এবং সুসংহত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার (সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র) দিকে অগ্রসর হওয়া। অপর প্রবণতাটি হল স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র। যার সর্বাধিক আক্রমণাত্মক, প্রতিক্রিয়াশীল রূপটি হল 'ফ্যাসিবাদ'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বে দেশে দেশে বিপন্ন গণতন্ত্র এই উভয় প্রবণতারই জন্ম দিয়েছে। একদিকে রাশিয়ার বুকে নভেম্বর বিপ্লব (সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব) এবং অপরদিকে ইতালির বুকে মুসোলিনি এবং জার্মানিতে হিটলারের মতো ফ্যাসিস্ত খলনায়কদের উত্থান। অবশ্য ঐ সময়েই এই দুইয়ের বাইরে তৃতীয় একটি মধ্যপন্থাও খুঁজে বের করা হয়েছিল। যার নাম জনকল্যাণকামী অর্থনীতি। প্রবক্তা জন মেইনার্ড কেইন্‌স্। এটি এমন একটি মধ্যপন্থা, যা একদিকে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করবে, অপরদিকে লগ্নীপুঁজির স্বার্থকেও সুরক্ষিত রাখবে। অবশ্য তৎকালীন লগ্নীপুঁজি (লেনিনকর্তৃক সংজ্ঞায়িত) ছিল জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক (ব্রিটিশ পুঁজি, ফরাসি পুঁজি প্রভৃতি)। জাতিরাষ্ট্র ভিত্তিক লগ্নীপুঁজি তার নিজের স্বার্থকে সুরক্ষিত ও সম্প্রসারিত করার জন্য, অপর জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক লগ্নীপুঁজির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হত (দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ)। আর এই সংঘর্ষে জয়ী হবার জন্য তার প্রয়োজন ছিল হিটলারের মতো হিংস্র ফ্যাসিস্ত চরিত্রের। যেখানে গণতন্ত্রের বাহ্যিক কাঠামোটাকেই ভেঙ্গে ফেলা হত।

কিন্তু বিশ্বায়ন পর্বে লগ্নী-পুঁজির চরিত্র বহুজাতিক। ফলে জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা আজ অনেকটাই দূরীভূত। আজ লগ্নীপুঁজির প্রয়োজন পৃথিবীময় অবাধে ছুটে বেড়ানোর ছাড়পত্র। জাতিরাষ্ট্র থাকবে, কিন্তু তার আইন-কানুন লগ্নীপুঁজির চঞ্চলতাকে প্রশ্রয় দেবে, বাধা দেবে না। বিশ্বায়ন পর্বের লগ্নীপুঁজির আর মুসোলিনী বা হিটলারের মতো ফ্যাসিস্ত শাসক প্রয়োজন নেই। কোনো একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক কাঠামোটাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। বরং যা প্রয়োজন তা হল রাজনৈতিক সাম্য ভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এমন একটি দল বা একজন শাসককে ক্ষমতায় বসানো যাঁরা বা যিনি নির্দ্বিধায় লগ্নীপুঁজির স্বার্থকে রক্ষা করবেন।

আমাদের দেশে প্রথমে মনমোহন সিংকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসানো এবং পরবর্তীতে সেই জায়গায় নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে আসা লগ্নীপুঁজির গেম-প্ল্যান। কারণ এর মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র থাকছে, নিয়মিত নির্বাচনও হচ্ছে, এমনকি সরকারের পরিবর্তনও হচ্ছে। কিন্তু যার পরিবর্তন হচ্ছে না তা হল লগ্নীপুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী নীতির। ফলে গণতন্ত্রকে রেখেই এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে লঘু করে ফেলা হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর দলকেই আজ লগ্নী-পুঁজির বিশেষ পছন্দ, কারণ এঁরা আদর্শগত দিক থেকেই গণতন্ত্রের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের বিরোধী। যেমন, গণসার্বভৌমিকতা, মানুষের মর্যাদা, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা, সর্বাধিক জনকল্যাণ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি, দেশপ্রেমের উন্মেষ প্রভৃতি। ফলস্বরূপ গণতন্ত্রের বাহ্যিক আবরণের ইতর-বিশেষ না ঘটলেও, বিপন্ন হয়ে পড়ছে এর মর্মমূল এর কার্যকরী অস্তিত্ব।

গণতন্ত্রের কেন্দ্রে থাকে মানুষ। তাই গণতন্ত্র বিপন্ন হলে তার আঁচ এসে পড়ে মানুষের ওপরেই। ইতিহাসের শিক্ষা হল মানুষ তখন ঘুরে দাঁড়ায় বিপন্ন গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য। আর এই কাজে মানুষের স্বাভাবিক নেতা হলেন তাঁরাই যাঁদের গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণাটা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ (অর্থনৈতিক সাম্যসহ)। বামপন্থীরাই গণতন্ত্রের ভূ-লুণ্ঠিত পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। এক্ষেত্রে বামপন্থীদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার লড়াইয়ের অর্থ দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, জোট নিরপেক্ষ বিদেশ নীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করাই লড়াই। এর মধ্যে প্রথম দুটি প্রত্যক্ষভাবে লগ্নীপুঁজির স্বার্থ বিরোধী এবং তৃতীয়টি (ধর্মনিরপেক্ষতা) দুর্বল হলে, পরোক্ষে লগ্নীপুঁজির সুবিধা হয়। তাই বামপন্থীদের শক্তিকে দুর্বল করার জন্য লগ্নীপুঁজি খোঁজে এমন কিছু স্থানীয় শক্তিকেও যারা আদর্শগতভাবে সম্পূর্ণ ছিন্নমূল, যাদের রাজনৈতিক কার্যপ্রণালী, রাজনৈতিক ভাষা সম্পূর্ণ লুম্পেন ধর্মী, যারা অনুশোচনাহীনভাবে অজস্র মিথ্যা বলতে পারে, যে কোনো ধরনের বিরোধিতাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য ঝটিকা বাহিনী প্রস্তুত করে (অনেকটা মুসোলিনির ব্ল্যাক শার্ট আর হিটলারের ব্রাউন শার্ট বা স্টর্ম ট্রুপারদের মতো) এবং সর্বোপরি যারা ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের উচ্ছিষ্ট ভোগ করতে আগ্রহী।

বামপন্থীদের শক্তিশালী ঘাঁটি পশ্চিমবাংলায় উপরোক্ত সর্বগুণ সমন্বিত একটি গোষ্ঠীর সন্ধান লগ্নীপুঁজি পেয়েছিল। তাই তো কলকাতার মার্কিন কনস্যুলেটের এক আধিকারিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেইল করেন (২০০৭)—'We need to cultivate...'. এই পরিকল্পনার ভয়াবহ পরিণতি মানুষ প্রত্যক্ষ করছেন। আজ পশ্চিমবাংলায় শুধু গণতন্ত্র বিপন্ন নয়, আদিমতার রাজত্ব কায়েম হয়েছে। তাই সর্বস্তরের মানুষের ঐক্যবদ্ধ জোটই পারে এই জঙ্গলের রাজত্বকে উচ্ছেদ করতে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন এই সুযোগ মানুষের সামনে এনে দিয়েছে।

আসুন বিশ্বকবির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলি—"**... আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।...**" □

২৫ মার্চ, ২০১৬

হউক গণপ্রত্যাখ্যান

'সততার প্রতীক'। কিয়ৎবৎসর পূর্বে ইতি-উতি দৃষ্টিপাত করিলেই, এবংবিধ বিজ্ঞাপন সংবলিত 'হোর্ডিং' ও 'কাট-আউট' চক্ষুগোচর হইত। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, উক্ত বিজ্ঞাপনে শোভা পাইত মদীয় রাজ্যের একমেবদ্বিতীয়ম শ্বেতবসনা, হাওয়াই চটি পরিহিতার সহাস্য চিত্র। সংবাদ মাধ্যমে গুরুগম্ভীর চর্চা চলিত 'সততা'-র অতলান্ত গভীরতা লইয়া। সংবাদমাধ্যমের তদন্তধর্মী নিবন্ধ পাঠ করিয়াই আমরা জ্ঞাত হইয়াছিলাম সং মহাশয়ার জলবৎ সরল ও স্বচ্ছ জীবনপ্রণালী। অতীব যত্ন সহকারে এমন একজন বাহুল্য বর্জিত জননেতার ভাবমূর্তি নির্মাণ করা হইয়াছিল, যাহা তুলনীয় ছিল শুধুমাত্র মহাত্মা গান্ধীর ভাবমূর্তির সহিত।

স্বভাবতই এমন একজন সৎ ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্না জননেত্রীর ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণহেতু রাজ্যবাসীর মনোজগতে সৎ ও দক্ষ প্রশাসন প্রত্যক্ষ কবিতার প্রত্যাশা জন্ম লাভ করিয়াছিল। তাহার পর গঙ্গাবক্ষে লক্ষ লক্ষ কিউসেক জল প্রবাহিত হইয়াছে, সততার প্রতিমূর্তি জননেত্রীরও প্রশাসন পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট পাঁচ বৎসর সময়কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে।

স্বভাবতই পাঁচ বৎসর সমাপনান্তে রাজ্যবাসীগণের স্বাভাবিক সাধারণ আত্মজিজ্ঞাসা হইল, 'সততা'র পেটেন্ট প্রাপ্ত জননেত্রী কি সত্যই বস্তুত তাহাই যাহা প্রচারিত হইয়াছিল? তিনি কি সততা ও স্বচ্ছতার সহিত প্রশাসন পরিচালনা করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন তাহা হইলে আজ আর রাজ্যের কোনো প্রান্তে 'সততার প্রতীক' বিজ্ঞাপন সংবলিত কোনো 'কাট-আউট' বা 'হোর্ডিং' দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? কেনই বা সংবাদপত্রে ভ্যানিটি ব্যাগে মাত্র ৪৭ টাকা লইয়া বিদেশ ভ্রমণের ন্যায় চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয় না? 'নেক্‌স্‌ট টু গান্ধী' রূপে যাঁহার ভাবমূর্তি সযত্নে নির্মিত হইয়াছিল, তাঁহার দৃষ্টান্তমূলক সততা ও সরল জীবনযাপন লইয়া ডম্বরু বাজাইবার কাজটি সংবাদমাধ্যম পরিত্যাগ করিল কেন? এবংবিধ প্রশ্নাবলীর উত্তর খুঁজিতে হইলে বিগত পাঁচ বৎসরের বিবিধ ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন।

ভাবসম্প্রসারণ পরিত্যাগ করিয়া একটি বাক্যে যদি উপরোক্ত বিষয়ে (জননেত্রীর সততা) প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, বিগত পাঁচ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে একটি 'দুর্নীতি'-র রেলপথ (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মাননীয়া এককালে রেলের অধীশ্বরী ছিলেন) নির্মিত হইয়াছে। ইহার প্রথম স্টেশনটির নাম 'সারদা' এবং সর্বশেষ স্টেশনটির নাম 'নারদ'। সর্বশেষ এই অর্থে, যেহেতু পাঁচ বৎসর সময়কাল ইতোমধ্যেই অতিক্রান্ত হইয়াছে। সময় হাতে থাকিলে, নিশ্চিতরূপে 'নারদ'-পরবর্তী আরও এক-আধখানি দুর্নীতির রোমহর্ষক কাহিনী দৃষ্টিগোচর হইতো। যাহা হউক আপাতত পাঁচ বৎসরে 'সারদা টু নারদ' চাঁদির রেল লাইন নির্মিত হইয়াছে, ভায়া 'গোলাপ-উপত্যকা' (রোজ ভ্যালি)!

সততার মনোপলি কারবারী ও তাঁহার রত্নখচিত পারিষদগণ দুর্নীতির প্রশ্নে দুরন্ত 'পারফরমেন্স'-এর যে ধারাবাহিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বর্তমান সময়ে একমাত্র তুলনীয় ভারতীয় ক্রিকেট দলের সহঅধিনায়ক বিরাট কোহলির ধারাবাহিক উচ্চমানের ব্যাটিং শৈলী প্রদর্শনের সহিত। সারদা, রোজ-ভ্যালি, ত্রিফলা, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ ইত্যাদি ইত্যাদি দুর্নীতির সাতকাহন সাধারণ মানুষ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন, দূরদর্শনের মাধ্যমে শুনিয়াছেন এবং লক্ষ লক্ষ ভুক্তভোগী যাঁহারা সবকিছু হারাইয়াছেন, তাঁহাদের যন্ত্রণা তো রহিয়াছেই। কিন্তু সর্বশেষ নারদকাণ্ডে স্টিং অপারেশনের সুবাদে সাধারণ মানুষ যাহা চাক্ষুষ করিলেন তাহা নিদারুণ ঘৃণা ও বমন উদ্রেককারী। কেহ পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক প্রভুর ন্যায় তাকিয়ায় ভর দিয়া অর্ধ-শায়িত অবস্থায় বান্ডিল বান্ডিল নোট গ্রহণ করিতেছেন। কেহ বা দুই ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট ঝুলাইয়া চলচ্চিত্রের খলনায়কের ভঙ্গিমায় উৎকোচ গ্রহণ করিতেছেন। এক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক সম্ভবত থিওরি অফ রিলেটিভিটি আউড়াইতে আউড়াইতে উৎকোচ গ্রহণ করিতেছিলেন। তাঁহার থিওরি অফ রিলেটিভিটি সম্ভবত এইরূপ $\rightarrow E=mc^2$, যেথায় E=Efficiency বা দক্ষতা, m=money বা অর্থ এবং c=corruption বা দুর্নীতি। অর্থাৎ শাসকের দক্ষতা পরিমাপের মাপকাঠি হইল অসদ-উপায়ে অর্থ উপার্জন ও বহুবিধ দুর্নীতির সহিত যুক্ত থাকিবার সক্ষমতা। প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানসাধক আইনস্টাইন কবরে শায়িত অবস্থায় সম্ভবত লজ্জায় মুখ ঢাকিতেছেন।

বিবিধ দুর্নীতির ঘটনাবলী যখনই জনসমক্ষে আসিয়াছে তখনই শাসক দল বিভিন্ন বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছে। কখনও বলা হইয়াছে 'আমরা সবাই চোর, আমাদের গ্রেপ্তার কর', কখনও ইনডিভিজ্যুয়াল চৌর্যবৃত্তির তত্ত্ব আমদানি করা হইয়াছে। কখনও আদালত সম্মুখে সওয়াল করা হইয়াছে নারদ হইতে যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা উৎকোচ নহে, অনুদান। এহেন অনুদান তোয়ালে মুড়িয়া টেবিলের ড্রয়ারে লুকাইবার প্রয়োজন হইল কেন?

সর্বাধিক বিস্ময়কর হইল, শ্বেতবসনার প্রতিক্রিয়া। একদা যিনি পান হইতে চুন খসিলেই সিবিআই তদন্তের দাবি করিতেন, তিনি বর্তমানে সিবিআই শুনিলেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছেন। এমনকি সারদা কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত ঠেকাইবার জন্য সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। সারদা কর্তা ও রোজ-ভ্যালি কর্তার সহিত 'ডেলো' পাহাড়ে বৈঠকটি কেন করিয়াছিলেন তাহারও কারণ রাজ্যবাসীর নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

প্রশাসনিক প্রধানের শ্বেতবসনে শুধুমাত্র দুর্নীতির ছোপ পড়িয়াছে তাহাই নয়, সরল জীবন যাবনের কল্পপ্রচারও মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রশাসনিক অথবা দলীয় কাজে তিনি যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থাপনা হইতে স্পষ্টত যাহা প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা হইল চূড়ান্ত ভোগ ও বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপনেই তিনি অভ্যস্ত এবং তাঁর ও পারিষদগণের ভোগ-বিলাসের স্বার্থে জনগণের অর্থ নয়-ছয় করিতে বিন্দুমাত্র বিবেক দংশন অনুভব করেন না। সর্বোপরি এই রাজ্যের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সততা, স্বচ্ছতা ও মূল্যবোধের যে প্রশংসনীয় মাত্রা পূর্ববর্তী তিন দশকেরও অধিক সময় ধরিয়া পরিব্যপ্ত ছিল, তাহাকে ভূ-লুণ্ঠিত করিবার নিন্দনীয় কাজটি ইহারা সম্পন্ন করিয়াছেন। কৃৎকর্মের শাস্তি উহাদের প্রাপ্য। ক্ষমতা হইতে অপসারণই হউক গণআদালতের ঘোষিত রায়। □

১২ চৈত্র, ১৪২২

শোক সংবাদ

অশোক ঘোষ

বামফ্রন্টের প্রবীণ নেতা ও সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ গত ৩ মার্চ কলকাতার একটি বেসরকারী হাসপাতালে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। ফুসফুসে সংক্রমণ জনিত ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অকৃতদার।

১৯৫১ সাল থেকে আমৃত্যু একটানা ৬৫ বছর তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৩ সলের ২ জুলাই তিনি হুগলীর চুঁচড়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা চারুচন্দ্র ঘোষ ও মাতা হরিমতী দেবীর তৃতীয় সন্তান। পঞ্চম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষায় প্রচণ্ড দৃষ্টি শক্তির অভাবে বোর্ডে লেখা অঙ্ক করতে পারেননি। পরে চশমার সাহায্যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। কিন্তু চোখের সমস্যার জন্যই আনুষ্ঠানিকভাবে আর পড়াশুনা চালাতে পারেননি।

১৯৩০ সালে সাত বছর বয়সে চুঁচড়ায় কংগ্রেস মিছিলে পা মিলিয়েছেন। বাড়িতে মার সাথে চরকা কেটেছেন। জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষের প্রভাবে তিনি নেতাজীর আদর্শ গ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে ৬ মাস কারারুদ্ধ ছিলেন। দমদম সেন্ট্রাল জেলে থাকাকালীন ফণী মজুমদারের কাছে মার্কসীয় শিক্ষা নেন। বামপন্থী ঐক্য রক্ষা ও মজবুত করার লক্ষ্যে তিনি ছিলেন এক সংগ্রামী সৈনিক। □

এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ছাড়া মাথা উঁচু করে বাঁচা যাবে না

অসিত কুমার ভট্টাচার্য

নতুন নিয়োগ কর্তার অধীনে রাজ্য সরকারী কর্মচারী হিসাবে চাকরীকালের প্রায় পাঁচ বছর সম্পূর্ণ হতে চলল আমাদের। এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলাম আমরা। রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতন হয় এমন সমস্ত অংশের শ্রমিক-কর্মচারী, পঞ্চায়েত, পৌরসভা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, অন্যান্য স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীরাও কম-বেশি একইরকম অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। সাতের দশকের শেষ থেকে আট বা নয়ের দশক, কিংবা একবিংশ শতকের প্রথম দশকে এই রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারী হিসাবে যাঁরা কাজে যোগ দিয়েছেন তাঁরা এক অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে পড়েছেন। রাজ্যে নাগরিক জীবনে শহরে গ্রামে যেমন এক শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি রাজ্য প্রশাসনের অন্দরে সৃষ্টি হয়েছে এক দম বন্ধ করা পরিস্থিতি। নবান্ন থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর পর্যন্ত সারা রাজ্য জুড়ে সরকারী দপ্তরে একটা চাপা আতঙ্ক সকলকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কোনো অভাব-অভিযোগ, দাবি-দাওয়া, সমস্যা, অসুবিধা উত্থাপন করা যাবে না, শোনার মতো কেউই নেই। এই সময়কালে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দাবিই মেটে নি। তা সে কেন্দ্রীয় হারে প্রাপ্য মহার্ঘভাতাই হোক, ২০০৮ সালে গঠিত ৫ম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অংশের সুপারিশই হোক, কিংবা গ্রুপ ডি, গ্রুপ সি, গ্রুপ বি-র হাজার হাজার শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগই হোক। এমনকি ক্যাডার পলিসি অনুযায়ী কর্মচারীদের প্রাপ্য দিনগুলি থেকে প্রোমোশনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন হাজার হাজার সরকারী কর্মচারী। শুধু তাই নয়, এই নিদারুণ আর্থিক প্রবঞ্চনা ও ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে কর্মচারীরা যখন প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছেন, সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন, ধর্মঘট করছেন তখন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে রাজ্য প্রশাসন তুমুল আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। পরিকল্পিত ভাবে নির্বিচারে বদলী করা, হুমকি দেওয়া, অধিকারগুলি কেড়ে নিয়ে নানা বিধি, নিয়ম-কানুন প্রণয়ন, শারীরিক আক্রমণ, জরিমানা পর্যন্ত করা হচ্ছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী 'রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙে দিন' এই আবেদন জানাচ্ছেন। ট্রেড ইউনিয়ন, গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন, বিপন্ন বিধিবদ্ধ ধর্মঘটের অধিকার। একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পশ্চিমবাংলায় চলেছে এক নজিরবিহীন অন্ধকারময় রাজত্বের পর্ব।

অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। 'পরিবর্তন'-এর ডাক দিয়ে 'সুশাসন'-এর স্লোগান তুলে অজস্র 'প্রতিশ্রুতি' আর 'ঘোষণা' করা হয়েছিল। 'উন্নয়ন' আর 'গণতন্ত্র' প্রসারিত করে 'জনস্বার্থবাহী গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল সরকার হিসাবে কাজ করবে'—নির্বাচনী ইস্তেহারে এই সদম্ভ ঘোষণা করেছিল সেদিনের বিরোধী দল আজকের শাসক দল। সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল, "সরকারি কর্মচারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। তাঁদের দীর্ঘদিন যেসব বক্তব্য উপেক্ষিত ছিল, যেসব বঞ্চনা দীর্ঘদিন তাঁরা সহ্য করেছেন, গোটা বিষয়টি যথার্থ বিবেচনার মাধ্যমে আশু পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"—*নির্বাচনী ইস্তেহার ২০১১, পৃষ্ঠা-১২*

জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতি ছিল, "সরকার দেবে দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন, দলবাজি হবে না। দলতন্ত্রের বদলে প্রতিটি কাজে থাকবে গণতন্ত্র, নৈতিকতা, স্বচ্ছতা।"... শুধু তাই নয়, তারও আগে প্রতিশ্রুতি ছিল, "পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের অবস্থা অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির মতোই শোচনীয়, ফিফথ্ পে-কমিশনের সুপারিশ কার্যকর এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ওটা শেষ করে সিক্সথ পে-কমিশনকে আপ-টু-ডেট করতে হবে। এক্ষেত্রে জানুয়ারী ২০০৬ থেকে মার্চ ২০০৮—এই ২৭ মাসের বেতন সরকার কোনোভাবেই দিতে রাজী নয়। এটা অবশ্যই দিতে হবে। এছাড়া সরকারী ক্ষেত্রে সাড়ে তিন লক্ষ শূন্যপদ আছে। এখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোক নিয়োগ হলে সাড়ে তিন লক্ষ বেকার যুবকের চাকরি নিশ্চিত। এর পাশাপাশি এই সাড়ে তিন লক্ষ শূন্যপদে লোক নিয়োগ হলে চাকরিরত সরকারি কর্মচারীদেরও প্রমোশন হতে পারে। যা বছরের পর বছর আটকে আছে।" আরও বলা হয়েছিল, "সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা আপ-টু-ডেট হয়নি। সর্বোপরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ভাতা না থাকায় অন্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যে বেতন প্রায় অর্ধেক।"—*নির্বাচনী ইস্তেহার, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৪৯*

কি হবে আজ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের? বর্তমান সরকারের আমলে পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাই সারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে কম বেতন পান। '২৭ মাসের বকেয়া', '৩০ শতাংশ বাড়ী ভাড়া ভাতা', 'পরিবহন ভাতা', 'শিক্ষা ভাতা' সব আজ বিলীন। শাসক দলের কর্মচারী সংগঠনের নেতারা আজ ভুলেও উচ্চারণ করেন না। এই সিক্সথ পে-কমিশন গঠনের জন্য রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট পর্যন্ত করতে হয়েছে। আর আপ-টু-ডেট মহার্ঘভাতা? কর্মচারীরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। বেতন বৃদ্ধি নয়, মূল্যবৃদ্ধির / মুদ্রাস্ফীতির জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ মহার্ঘভাতা আজ মুখ্যমন্ত্রী দয়ার দানে পরিণত করেছেন, কোনো ন্যায্য, স্বীকৃত, অর্জিত পাওনা নয়, 'কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা', মুখ্যমন্ত্রী যেমন মনে করবেন, তেমন রেটেই মহার্ঘভাতা হবে। যেদিন চাইবেন সেদিন থেকে মহার্ঘভাতা হবে। তাই ২০১২ সালের ১ জুলাই—৭%, ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি—৮% কে টপকে ২০১৩ সালে ১ জুলাই—১০% ঘোষিত হল জানুয়ারি ২০১৬ সাল থেকে। সারা ভারতবর্ষে এমন নজির নেই। ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি—৬% ধরে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পাওনা হল ৭ কিস্তিতে ৫০ শতাংশ মহার্ঘভাতা। একজন গ্রুপ 'ডি' কর্মচারীর ১ শতাংশ ডি.এ.-র মূল্য ৬৬ টাকা। ৫০ শতাংশ ডি.এ. বকেয়া

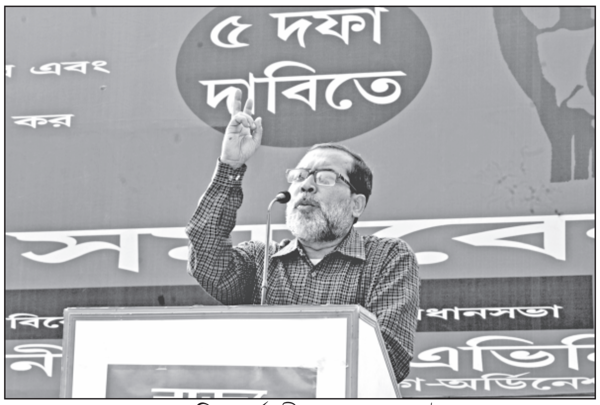

থাকায় একজন গ্রুপ 'ডি' কর্মচারী মাসে ৩৩০০ টাকা কম পাচ্ছেন। একজন প্রাথমিক শিক্ষক/গ্রুপ 'সি' কর্মচারী কম পাচ্ছেন ৪০০০ টাকা (১ শতাংশ ডি.এ.-র মূল্য ৮০ টাকা, ৮০x৫০=৪০০০ টাকা)। একটি হিসাবে দেখা যায় প্রাপ্য মহার্ঘভাতা না পাওয়ার কারণে কর্মচারীদের হারানো মহার্ঘভাতার পরিমাণ গত ক'বছরে অন্যূন ৪০,০০০ টাকা, ভাবতে পারেন?

এ কথা কি সত্যি যে রাজ্যের বিপুল দেনার কারণে রাজ্য সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এই ন্যায্য পাওনা দিতে পারছে না? ক্ষমতায় আসার আগে সরকার জানতো না রাজ্যের এই বিপুল দেনার কথা? ২০০৯ ও ২০১১-র নির্বাচনী ইস্তেহারের ছত্রে ছত্রে রাজ্য আর্থিকভাবে চূড়ান্ত দেউলিয়া, সরকারি কর্মীদের শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার টাকা নেই। লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা দেনা'র কথা জানানো হয়েছে। জানানো হয়েছে, 'যে রাজ্য ঋণের ফাঁদে অর্থনীতিকে ঠেলে দিয়েছে।' সেই রাজ্যের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কল্পতরুর মত সব দেবেন বলেই তো নির্বাচনী ইস্তেহার 'স্বপ্ন, কল্পনা আর মায়া' দিয়ে তৈরী হয়েছিল। অধ্যাপক অভিরূপ সরকার সহ স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ্রা ছিলেন সেই ইস্তাহার রচনাকার। রাজ্যের ক্ষমতায় এসেই মন্ত্রীদের ভাতা বাড়ানো হল দশ গুণ। মন্ত্রীদের ঘর-দোর, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি কমপিউটার সব নতুন করে সাজানো হল। রাস্তাঘাট, সরকারি বাড়ী সব নতুন করে রঙ হল। নাম পাল্টালো। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হল। দপ্তর পুনর্গঠনের নামে এদিক-ওদিক করানো হল। লক্ষ লক্ষ টাকা নয়-ছয়। সরকারী গাড়ী, টেলিফোন, এসি মেশিন বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হল। অথচ কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা মোটানোর বেলায় টাকা নেই। নব্বই দশকের গোড়া থেকেই পূর্বতন সরকার আর্থিক সঙ্কটের কারণে Economy Measure নিয়ে অর্থ দপ্তর থেকে নির্দেশনামা জারী করে গাড়ী, টেলিফোন, কম্পিউটার, সরকারী খরচ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। বেশ কয়েক দফায় এই নির্দেশিকা বের করে সরকার ব্যয় সঙ্কোচ করার চেষ্টা করে। আর বর্তমান সরকার? সরকারী দপ্তরে মেঝে, সিঁড়ি, বাথরুমের নতুন টাইলস্ সরিয়ে আবার টাইলস্ বসানো হচ্ছে। পুরনো গাড়ী বদলে নতুন নতুন মডেলের গাড়ী। টেলিফোন, কমপিউটার ল্যাপটপের যথেচ্ছাচার। সরকারী বৈঠকে কোর্মা, কাবাব, বিরিয়ানি—শতেক সমাহার। এর সঙ্গে বারো মাসে তেরো পার্বণ নয়, যাট পার্বণ। খেলা-মেলা উৎসব, ভূষণ-বিভূষণ, নানা পারিতোষিক বিতরণ। প্রশাসনিক সভা। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা উড়ানোর উৎসব। এগুলি কি সরকারের অস্বচ্ছলতার, আর্থিক সঙ্কটের নিদর্শন। অথচ বলা হচ্ছে দ্বিগুণ রাজস্ব আদায়ে 'এগিয়ে বাংলা'। জি.এস.ডি.পি. বাড়ছে ৭.৫ শতাংশ হারে। কোনটা সত্যি? দেনাটি সত্যি, না সরকারী কর্মচারীদের ন্যায্য প্রাপ্য দেব না—কোনটা সত্যি?

আমাদের ন্যায্য দাবি আদায়ে কী আমরা করি নি। মহার্ঘভাতা যা আমরা পাঁচ বছরে মাত্র পাঁচটি কিস্তিতে পেয়েছি (২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬-র জানুয়ারি ধরে) তার সবকটি আমাদের সম্মিলিত আন্দোলন, জনগণের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার ফসল। ৫৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া পড়ে যাওয়ায় সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে আলোড়ন পড়ে যায়। সমস্ত সংবাদপত্র, চ্যানেলে সরকারী কর্মচারীদের সার্বিক বঞ্চনার বিষয়টি 'জনগণের বিষয়' হয়ে উঠে। 'তিনমাস অন্তর নিয়মিত বৈঠক', 'ন্যায্য দাবির মীমাংসা অস্বীকৃত হলে ২০১১ সালের ২২ নভেম্বর ৬ দফা দাবিতে আমরা প্রথম বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত করি। তারপর ৭ দফা দাবিতে ৫ জুলাই, ২০১২ কলকাতায় জেলা-অঞ্চলে বিক্ষোভ সমাবেশ, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, পঞ্চায়েতস্তরের কর্মচারীদের নিয়ে ১১ ডিসেম্বর ২০১২তে ৮ দফা দাবিতে দাবি দিবস ও বিক্ষোভ সমাবেশ, কলকাতায় ৭ দফা দাবিতে ৭ আগস্ট, '১৩ গণঅবস্থান, জেলায় জেলায় দাবি প্রস্তাব গ্রহণ ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ, ৮ দফা দাবিতে ২৭ নভেম্বর, ২০১৩ বিধানসভা অভিযান, ১০ সেপ্টেম্বর '১৪ ৬ দফা দাবিতে দক্ষিণ বাংলায় কর্মচারীদের কলকাতায় বিশালজমায়েত, উত্তর বাংলার কর্মচারীদের শিলিগুড়িতে জমায়েত, ৬ দফা দাবিতে ১১-১৫ ডিসেম্বর '১৪, ৫ দিনব্যাপী ওয়াই চ্যানেলে গণঅবস্থান, ২০১২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জরুরী ও জ্বলন্ত দাবির মীমাংসা চেয়ে, দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা চেয়ে ৪ ডজন চিঠি, দপ্তরে দপ্তরে এ্যাপ্রন পরিধানের কর্মসূচী, দাবি ব্যাজ পরে দপ্তরে দপ্তরে গণ-অবস্থানের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং পঞ্চায়েত পৌরসভা ও পরিবহন বিদ্যুৎ সহ স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের নিয়ে বৃহত্তম মঞ্চ (৩৮টি সংগঠনের) গড়ে তুলে কর্মস্থলে এবং ধর্মঘটসহ কেন্দ্রীয় কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ ২৮ জানুয়ারি ২০১৬ কলকাতার ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় সমাবেশ তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। কিন্তু সরকারের কোনো টনক নড়ে নি। নিজস্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে, সরকারী কর্মচারীদের ন্যায়-সঙ্গত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির সমাধানে সরকার যত্নবান হয়নি।

শুধু কি এই? রাজ্য সরকার সংগঠিত কর্মচারী আন্দোলন, প্রতিবাদ, দাবি আদায়ের সংগ্রামকে পর্য্যুদস্ত করতে স্বৈরাচারী ভূমিকা নিয়েছে। ঐতিহ্য রক্ষার নামে মহাকরণ থেকে দপ্তর নবান্নে স্থানান্তর, মহাকরণ ক্যান্টিন হল ও ক্যান্টিন কো-অপারেটিভ ভেঙে দেওয়া, মহাকরণ দপ্তরের কর্মচারীদের রিক্রিয়েশন ক্লাব ভেঙে দেওয়া, ঐতিহ্যপূর্ণ লাইব্রেরীকে উৎখাত করা, ব্যাপকভাবে দপ্তরগুলির বিচ্ছিন্নভাবে বিন্যাস, দপ্তর পুনর্গঠনের নামে একই ছাদের তলায় নিয়ে আসার নামে যত্রতত্র, ব্যাপক কর্মচারীদের হয়রানিমূলক বদলী সংঘটিত হচ্ছে। লক্ষ্য হচ্ছে সংগঠিতভাবে যাতে কোনো প্রতিবাদ, আন্দোলন না হয়, এর সঙ্গে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ছুটির অধিকার। মহিলা কর্মচারীরা নানা ধরনের মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। রাজ্য প্রশাসনে এক অদ্ভুত নৈরাজ্য তৈরী হচ্ছে। নবানন্নসহ অনেক প্রশাসন কেন্দ্রে সভা-সমিতি বন্ধ। সরকারী হল পাওয়া যাবে না। ধর্মঘটের দিন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করলেও মহিলা কর্মচারীসহ সাধারণ কর্মচারীদের ছুটি নেওয়ার অধিকারকে তুঘলকী কায়দায় অপহরণ করে ভয়ঙ্করভাবে সন্ত্রস্ত করা হচ্ছে। মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট, ১৯৯৯ (3SCC679, 1999) সালে সংবিধানের ২১ নং ধারা 'Right to live'-র ব্যাখা করতে গিয়ে বলেছিলেন,

"On joining Government Service, a person does not mortgage or barter away his basic rights as a human beings, including his fundamental rights, in favour of the Government. The Govt. only because it has the power to appoint does not become the master of the body and Soul of the employee.... The Fundamental rights, including the right to life under Articles 21 of the Constitution of the basic human rights are not surrendered by the employee." কিন্তু তা সত্ত্বেও আধিকারিকদের একটি অংশ কড়া ব্যবস্থা নিতে তৎপর। অত্যন্ত পরিতাপের কথা হল, রাজ্য সরকার, তার আমলাবাহিনী এই সব ঘোষণা, ব্যাখ্যাকে নস্যাৎ করে চরম স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শুধু ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার,গণতান্ত্রিক অধিকার-এর মত বুনিয়াদী অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাই নয়। বিধি থাকা সত্ত্বেও আক্রমণ করা হচ্ছে ধর্মঘটের অধিকারকে। কেবল একদিনের বেতন কাটা নয়, তার সঙ্গে ১ দিনের চাকরি জীবন কেটে নেওয়া ('Dies non'), হুমকি, দূরবর্তী জায়গায় বদলী, ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে তাকে সন্ত্রস্ত করা হচ্ছে। অথচ ধর্মঘটের দিনকে বিশেষ ছুটির দিন হিসাবে স্পেশাল ক্যাজুয়াল লিভ দেওয়ার সরকারী আদেশনামা প্রকাশিত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সমগ্র কর্মচারী সমাজ প্রতিবাদে উত্তাল হচ্ছেন, অসন্তোষে ফুঁসছেন। এর স্থায়ী প্রতিকারের জন্য তারা নতুন লড়াইতে প্রবৃত্ত হচ্ছেন। মাটিতে কাঁপন শুরু হয়েছে।

কর্মচারী জীবনের এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা কেবল আহরণই নয়, বৃহত্তর নাগরিক সমাজের অংশ হিসাবে, সামাজিক মানুষ হিসাবে আরও অনেক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি আমরা। নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণের দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এই রাজ্য সরকার গত পাঁচ বছরে পনের বার বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে। বছরে ইউনিট পিছু—৬৭ পয়সা। দুধের দাম বাড়িয়েছে ৪ বার। পেট্রোল ডিজেলের আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমলে ও সাধারণ মানুষ তার সুবিধা পায়নি। কমেনি যাত্রী পরিবহনের খরচ ও রাজ্য সরকার এখন নির্বিকার। শুল্ক বসিয়ে টাকা তুলছে। আলু সহ শাক-সব্জীর দাম চলে যাচ্ছে নাগালের বাহিরে। চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, মাছ, মাংস প্রভৃতি অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর দামও উর্ধ্বমুখী। আর শিল্পজাত পণ্যের তো কোনো কথাই নেই।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষরা লাঞ্ছিত। প্রথিতযশা অধ্যাপক, উপাচার্যরা রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, স্বশাসন আক্রান্ত। ফিরে এসেছে গণ-টোকাটুকি। ৫ মাসেও বেরোয় না পরীক্ষার ফলাফল। টাকা দিয়ে এ্যাডমিশন। বিদ্যালয়ে, কলেজে হাজার হাজার শূন্যপদ খালি। সরকারী বিদ্যালয় ধুঁকছে, বাড়ছে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রমরমা। সরকার তাই তড়িঘড়ি বিল এনে যথেচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার অনুমতি দিচ্ছে। এক অদ্ভুত নৈরাজ্য গ্রাস করেছে শিক্ষাক্ষেত্রকে।

একই অবস্থা স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও। পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। প্রাইমারী, রুরাল, মহকুমা, জেলা হাসপাতালেও ৮০ শতাংশ চিকিৎসক নেই। হাসপাতালগুলি 'বেড অকুপেন্সী' হার নিম্নগামী। বিনা পয়সার চিকিৎসা দিতে গিয়ে হাসপাতালের প্রচলিত চিকিৎসার সুযোগ ওষুধপত্র উধাও। কম দামের ওষুধের দোকানে বেশী দামের ব্র্যান্ডের ওষুধ নিতে গিয়ে নাজেহাল সাধারণ চিকিৎসাপ্রার্থী। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের নির্বিচার

● (ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

প্রতিশ্রুতির ফানুস ফেটে গেছে

প্রণব কর

পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয় ২০১১ সালের ১৩ মে তারিখে। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেস-এস.ইউ.সি. জোট বিপুল সংখ্যক আসনে জয়লাভ করেছে। মোট প্রদত্ত ভোটের ৪৮.৪৩ শতাংশ ভোট পেয়ে জোটের আসন সংখ্যা দাড়ায় ২২৭টি। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একটা সামান্য অংশের মধ্যে এই ধারণা হয়েছিল যে এবার বোধ হয় পাওনা-গণ্ডার ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা হবে।

এই ধারণা সৃষ্টি হওয়ার পিছনে কর্মচারীদের কোন দোষ ছিল না। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ স্তর থেকে ২০১১-এর বিধানসভা পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন অলীক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ভোট পাওয়ার জন্য। পঞ্চম রাজ্য পে কমিশনের ২৭ মাসের বকেয়া এরিয়ারের টাকা দেওয়া হবে, আপ-টু-ডেট ডিয়ারনেস এ্যালাউন্স দেওয়া হবে, ডিয়ারনেস এ্যালাউন্সের স্টাণ্ডিং অর্ডার করা হবে ইত্যাদি হাজারো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেই সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। ২০১০-এর ডিসেম্বরে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্মেলন হয়েছিল সোনারপুরে। সেই সম্মেলন শেষ হবার তিন দিনের মধ্যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সেখানে গিয়ে ঘোষণা করে আসেন যে এ রাজ্যের রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা অন্য রাজ্যের তুলনায় অর্ধেক বেতন পান। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই কর্মচারীদের একাংশের মধ্যে এ ধরনের প্রত্যাশা তৈরী হয়েছিল যে নতুন সরকার হয়ত কর্মচারীদের কিছু নতুন আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরপরই তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার স্বমূর্তি ধারণ করে। নতুন সুযোগ সুবিধা দেওয়া তো দূরে থাকুক বরং একের পর এক কর্মচারী-অধিকার বিনষ্ট করেছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার। শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী বিরোধী একটি রাজনৈতিক দলের সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিরোধী কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবেই বর্তমান সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের উপর এই ব্যাপক বীভৎস আক্রমণ নামিয়ে এনেছে।

আক্রমণের সূচনা হয় ব্যাপক ভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বদলীর মধ্য দিয়ে। এক জেলা থেকে অন্য জেলায় কর্মচারীদের বদলী করা, দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে কর্মচারীদের বদলী করা হল প্রশাসনিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নয়, বরং কর্মচারীরা যাতে ভীত-সন্ত্রস্ত হন, ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্ম থেকে দূরে থাকেন তার জন্য। বিভিন্ন আদেশনামা জারী করে কর্মচারীদের উপরে নামিয়ে আনা হল আক্রমণ।

১৫৮৩-এফ(পি) তাং ২১/০২/২০১২—এই আদেশনামা দিয়ে টাইপিস্ট পদকে ডাইং ক্যাডারে পরিণত করা হল। অথচ প্রশাসনের অভ্যন্তরে টাইপের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু একফোঁটাও কমেনি। সর্বস্তরে সমস্ত আদেশনামা টাইপ হয়েই বের হচ্ছে। হয়ত পুরোনো টাইপ মেশিন উঠে গেছে, তার বদলে কম্পিউটার টাইপ হচ্ছে। কিন্তু টাইপের কাজটা থেকেই গেছে। ফলে বিভিন্ন জায়গাতে টাইপিস্ট পদটি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াতে সহায়ক এবং করণিকদের উপরেই টাইপ করার দায়িত্ব বর্তাচ্ছে। ফলে তাদেরকে একাধিক্রমে দুটি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হচ্ছে; কিন্তু তার বেতনের পরিমাণ একটুও বৃদ্ধি হচ্ছে না। অর্থাৎ টাইপিস্ট পদটিকে ডাইং ক্যাডারে পরিণত করে একদিকে যেমন একটি ক্যাডারকে ধ্বংস করা হল, পশাপাশি অন্য ক্যাডারগুলির কাজের পরিমাণ বিশালভাবে বৃদ্ধি করা হল। এই হল তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বর্তমান সরকারের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রতি প্রথম উপহার।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ আদেশনামাটি হল—১৮৩২-এফ(পি) তাং ০১/০৩/২০১৩ West Bengal Services (Appointment, Probation and Absorption of Group C Employees) Rules, 2013—গ্রুপ সি পদে নিয়োগের নতুন আদেশনামা। এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী নোটিফিকেশন নং ৬০৬০-এফ তাং ২৫/৬/১৯৭৯-এর সংশোধন ঘটিয়ে এই আদেশনামা জারি করা হয়, এর মধ্য দিয়ে নবনিযুক্ত কর্মচারীদের তিন বছর প্রোবেশন থাকতে হবে। প্রবেশন পিরিওডে প্রতিবছর শেষে তাকে যোগ্যতার পরিমাপ দিতে হবে। প্রোবেশন পিরিয়ডে তার মহার্ঘভাতা এবং বাড়িভাড়া ভাতা থাকবে না। এই তিন বছর সময়কাল তার MCAS পাওয়ার ক্ষেত্রেও গণ্য করা হবে না।

আদেশনামাটি পড়লেই বোঝা যাচ্ছে যে কোনোরকম প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই আদেশনামাটি বের করা হয়নি। শুধুমাত্র কর্মচারীদের ভীত সন্ত্রস্ত করবার জন্যই এই আদেশনামাটি বের করা হয়েছে। আদেশনামাটির ৬ নং পয়েন্টে বলা আছে—Discharge on non-satisfactory performance during the period of probation—In case of non-satisfactory performance or failing to pass the departmental examation or other examination as mentioned in rule 5, the Govt. employee concerned may be discharged. এখন প্রশ্ন হচ্ছে কাকে satisfy করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে? সে বিষয়ে কিছুই বলা নেই। এই ধোঁয়াশাটা রাখা হয়েছে ইচ্ছে করেই। আমলা বাহিনী এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষক সংগঠন যদি satisfied না হয় তবে এই তিন বছরের Probation Period-এর যে কোনো সময়ে একজন কর্মচারী চাকুরীচ্যুত হতে পারেন। এদেরকে satisfy করতে হলে নিজের দাবি-দাওয়া, কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন ধরনের অধিকার সংকোচনের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যাবে না। অর্থাৎ বঞ্চিত কর্মচারী সমাজ যাতে কোনোমতেই তার বঞ্চনা নিয়ে মুখ খুলতে না পারে, সে সংগঠিত হতে না পারে তার জন্যই এই আদেশনামা জারি করা হয়েছে।

রাইটার্স বিল্ডিং থেকে State Secretariat-কে সরিয়ে নবান্নতে নিয়ে যাবার মূল উদ্দেশ্যই ছিল কর্মচারীদের দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে জমায়েত, সংগঠিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে দেওয়া। কিন্তু নবান্নতে যখন কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবীদাওয়াকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হতে থাকলেন, নিচে বিক্ষোভ জমায়েত করতে থাকলেন তখন প্রমাদ গোনে প্রশাসন। তাই নবান্নতে কর্মচারীদের কোনো এসোসিয়েশন, ইউনিয়ন বা জোট কর্তৃক কোন সভা, মিছিল বা বিক্ষোভ করা (Meeting/Procession/Demonstration) নিষিদ্ধ করা হল ৮৪৩৬-এফ(পি) তাং ২৬/১১/২০১৩ দ্বারা। এইভাবে কর্মচারীদের মৌলিক অধিকারগুলিকে খর্ব করার মধ্য দিয়ে প্রশাসনকে ক্রমশ গণতন্ত্র বিরোধী এবং স্বৈরাচারী করে তোলা হচ্ছে।

এত কিছু করেও যখন কর্মচারীদের ঠিকমতো বাগে আনা যাচ্ছে না তখন রাজ্য প্রশাসন ১৭৫-এফ(পি) তাং ০৯/০১/২০১৪-এই নোটিফিকেশন জারি করে W.BS.R. Part-I-এর বিভিন্ন জায়গায় পরিবর্তন করে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ডেপুটেশন বা ডিটেলমেন্ট-এর দ্বারা ভারতবর্ষের মধ্যে বা বাইরে যে কোনো দপ্তর বা অফিসে এমন কি রাজ্য সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোনো কোম্পানি, কর্পোরেশন, আন্ডারটেকিং-এ পর্যন্ত স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। Public Interest-এর নামে এ সব কিছুই করা যাবে, কর্মচারীর ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা বা ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্য এখানে থাকবে না। নোটিফিকেশনের প্রথমেই Deputation এবং Detailment-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এ রকমভাবে—

Deputation means any appointment made by transfer on a temporary basis against a sanctioned post outside the regular line and in the public interest এবং Detailment means utilization of service of an employee in any job for a temporary period in the public interest under any Department or office of the Government or in any Company, Corporation, Undertaking and Statutory Body etc. which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government or by any body which is funded by the Government.

এই আদেশনামাতে W.B.S.R. Part-I-এর ৯৭ নং বিধিতে নতুন যে অংশটি যুক্ত করা হয়েছে সেটি হল—A Government employee may, if the State Government may deem fit and proper to do so to meet the exigency for any job and for optimum utilization of manpower as well as to realize full potential of such Govt. employee, be detailed in any other Department or Office under the Government or in any Company, Corporation, Undertakings, Statutory Government or by any body which is funded by the State Government, for a period not exceeding six months without following the provisions cotained in this chapter or elsewhere in these rules (and during such detailment, The terms and conditions of service including drawal of pay and allowances, promotion, sanction of leave, disciplinary control etc., shall remain with the parent cadre controlling authority or Department or office, as the case may be and shall not be alttered to the disadvantage of such Government employee may be entended beyond the period of six months if the concerned cadre controlling authority, or Department or the office or the Company Corporation, undertaking, statutory Body, etc. as above, feels it necessary or at the option of the concerned Government employees.)

ইতিমধ্যে ৩৯৬৭-এফ(পি) তাং ০১/০৮/২০১৪ মোমোরাণ্ডাম দ্বারা রাজ্য প্রশাসন ঘোষণা করেন যে রাজ্য সরকার দ্বারা পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত কোনো কোম্পানি, কর্পোরেশন, আন্ডারটেকিং, স্টাটিউটরি বডি যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে সেখানে নিযুক্ত চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের অন্য কোনো সংস্থা বা সরকারি অফিসে নিযুক্ত করা হবে এই শর্তে যে তাকে ভবিষ্যতে নিয়মিত (regularised) করা হবে না। এর ফলে চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের ৬০ বছর পর্যন্ত চাকুরী করার যে নিশ্চয়তা ছিল তা একদিকে যেমন খর্বিত হল তেমনই প্রশাসনের শূন্যপদ পূরণ করাও বন্ধ করা গেল।

তবে শুধুমাত্র এখানেই তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত প্রশাসন থেমে থাকেনি। W.B.S.R. Part-I-এর অধীন APPENDIX 6A-তে West Bengal Service (Duties, Rights and Obligations of the Govt. employees) Rules, 1980-এর Rights-এর (২) নং ধারায় লেখা আছে—every government employee shall have full trade union rights including the right to strike. ২৮/০২/২০১২ তারিখে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনগুলির ডাকে সে ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা তাতে যোগদান করবার জন্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে ১৫ দিন আগেই স্ট্রাইক নোটিস প্রদান করেন। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার কর্মচারী ইউনিয়নগুলির সঙ্গে কোনরকম আলোচনার পরিবর্তে ২৮৩(৬০)-পিএস তাং ২১/০২/২০১২ নামক আদেশনামা জারি করে রাজ্য সরকারের সমস্ত কর্মচারীকে বাধ্যতামূলকভাবে অফিসে আসতে আদেশ করে বলা হয় যে ঐ দিনের জন্য কোনো ছুটি অনুমোদন করা হবে না। একটি সরকারি আদেশনামা দিয়ে একটি বিধিকে বাতিল করা যায় না কখনও। বিধিকে পরিবর্তন করতে হলে বিধানসভাতে তা পাস করাতে হবে। অথচ রাজ্য প্রশাসন রাজ্যের Service Rule-এ কর্মচারীদের যে অধিকার দেওয়া আছে তা ভাঙছেন নিজেদের জারি করা প্রশাসনিক আদেশনামা দ্বারা। এর থেকে স্বৈরাচারী কার্যকলাপ কি হতে পারে?

পরবর্তীতে ২০১৩-এফ(পি) তাং ৬/৩/১২ মেমোরেন্ডাম জারি করে বলা হয় যে যারা ২৮/০২/২০১২ 'unauthorised absence'-এ ছিলেন তাদের Show Cause করা হবে।

(i) Hospitalisatin of employee, (ii) Bereavement in the family, (iii) Severe illness and absence continuing from before, (iv) Employees who had been on leave continuing from before, if such leave was sanctioned prior to the above Circular, (v) Compelling reasons of similar nature, where the employee could not report for duty for circumsatances beyond his control (Specific reasons with documentary proof will have to be furnished in each such case)—এই পাঁচটি কারণ ছাড়া অন্যক্ষেত্রে এ দিনের অনুপস্থিতিকে 'dies non' হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং এ দিনের জন্য কোনো বেতন কর্মচারীদের দেওয়া হবে না বলে এই মোমোরান্ডামে ঘোষণা করা হয়।

অনুরূপে ২৫৪-এফ(পি) তাং ১৮/০২/১৩ আদেশনামা দ্বারা ২০/২/১৩ এবং ২১/২/১৩ তারিখের সর্বভারতীয় ধর্মঘটে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বাধ্যতামূলকভাবে অফিসে আসতে বলা হয়। ৩৪০২-এফ(পি) তাং ২৮/০৪/১৫ দ্বারা ৩০/৪/১৫ তারিখের ধর্মঘটের দিন বাধ্যতামূলকভাবে কর্মচারীদের অফিস আসতে বলা হয়।

আবার এ রাজ্যের রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫-এর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং অর্ধশতাধিক ফেডারেশনের ১২ দফা দাবির ভিত্তিতে ডাকা ধর্মঘটকে পূর্ণ সমর্থন করে বকেয়া মহার্ঘভাতা, ষষ্ঠ পে কমিশন সহ নিজস্ব ৭ দফা এবং কেন্দ্রীয় ১২ দফা থেকে ২ দফা দাবি নিয়ে মোট ৯ দফা দাবিতে একই দিনে রাজ্যব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন। এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল রাজ্য সরকারী কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী ৩৫টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ। নিয়মমাফিক নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রাজ্য সরকারের কাছে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান করা হয়েছিল। এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রচার চালানো হয় কর্মচারী মহলে। প্রশাসনও বুঝতে পারে কর্মচারীরা এবারে ধর্মঘটের ব্যাপারে অনেক বেশি মরিয়া তাই প্রথম থেকেই ডায়েস-নন মাইনে কাটার হুমকি দিতে শুরু করে প্রশাসন। কিন্তু একেবারে শেষপর্বে এসে প্রশাসন যখন বোঝে যে এসবে খুব একটা কাজ হচ্ছে না, তখন ধর্মঘটের ঠিক আগের দিন ৬৫৩৫-এফ(পি) নামক এক ঘৃণ্য আদেশনামা জারি করে বলে যে ধর্মঘটের দিনের আগেপিছু ছুটি নিয়ে যারা অফিসে আসবেন না তাদের পুরো সময়কালটি ডায়েস-নন হবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয় যে এই আদেশনামার বিরুদ্ধে কোর্টে যাওয়া হবে। এর ফলে ধর্মঘটের দু'দিন পরে অপর একটি আদেশনামা ৬৬৪৯-এফ(পি) জারি করে প্রশাসন জানায় যে বৈধ ছুটির ক্ষেত্রে কোনো বেতন কাটা হবে না। এর ফলে সিসিএল, ইএল ইতাদি বৈধ ছুটিতে থাকা কর্মচারীদের একাংশ ২রা সেপ্টেম্বর অফিসে এসে পড়েন। শুধুমাত্র ধর্মঘটকে ভাঙবার জন্য কর্মচারীদের চূড়ান্ত অসুবিধায় ফেলে প্রশাসন এই ধরনের স্বৈরাচারী আদেশনামা বের করছে। এখানেই শেষ নয়। এবারই প্রশাসনিকভাবে প্রথমবার নবান্ন, রাইটার্স বিল্ডিং, টোডি ম্যানসন ও বিকাশ ভবনে ধর্মঘটের আগের দিন থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হয় ৬৫১৮-এফ(এইচ) তাং ৩১/৮/১৫ আদেশনামা দ্বারা।

স্বচ্ছভাবে প্রশাসনে নিয়োগের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে গ্রুপ 'সি' বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হত। আবার ৩৩২৬-এফ, তাং ৫/৫/২০০৯ দ্বারা তৎকালিন বামফ্রন্ট পরিচালিত রাজ্য সরকার সমস্ত ধরনের গ্রুপ 'ডি' পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন খুব স্বচ্ছভাবে বিপুল সংখ্যক কর্মচারীদের গ্রুপ 'ডি' পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করে। এইভাবে নির্বাচিত কর্মচারীদের একাংশ যারা মূলত স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন গ্রুপ 'ডি' পদে যোগদানের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, ২০১১-এর পরবর্তীতে সরকার পরিবর্তনের পর তাদের চাকুরীতে যোগদান বন্ধ রাখা হয়। শেষ পর্যন্ত সকল পরিক্ষার্থীরা স্যাট ও হাইকের্টে মামলা করে জয়ী হয়ে কাজে যোগদান করেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছভাবে গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ 'ডি' পদে নিয়োগের এই অধিকার বর্তমান সরকার কেড়ে নিয়েছে ৭৬০০-এফ(পি) তাং ২০/৯/২০১৩ দ্বারা।

একদিকে যেমন নতুন নিয়োগ বন্ধ হয়ে রয়েছে এই সরকারের আমলে তেমনি অবসরপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে চুক্তি ভিত্তিক কর্মচারীদের নিয়োগের জন্য ১০৯৩৫-এফ(পি) তাং ৫/১২/২০১১ প্রকাশ করা হয়, প্রশাসনিক ভাবে। এক বছরের জন্য নিয়োগ করা হলেও পরবর্তী ১৮৬৬এফ(পি) তা ৪/৩/১৩, ২১৯২-এফ(পি) তাং ২/৪/১৩ এবং ৪৯৪১-এফ(পি) তাং ১৯/৯/১৪ আদেশনামা জারি করে তাদের চাকুরীর মেয়াদ তিনবার বৃদ্ধি করা হয়। অতি সম্প্রতি ৮৪৭৩-এফ(পি) তাং ১৬/১২/১৫ আদেশনামা জারি করে আবার এই অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের চাকরির মেয়াদ এক বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হল।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় ৪৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বাকি রাখা, খুড়োর কলের মতো কর্মচারীদের সামনে একটি পে-কমিশন ঝুলিয়ে দেওয়া, ধর্মঘটের অধিকার ও সংগঠনকরার অধিকার সহ বিভিন্ন অধিকারের উপর তীব্র আক্রমণ নামিয়ে আনা, সংগঠন করলে দূরদূরান্তে বদলী করা, চাকুরীর স্থায়িত্বকে নড়বড়ে করে দেওয়া, গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিকে ডাইং কাডার পরিণত করা, আমলাদের দিয়ে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ানো—এসবই হল বর্তমান সরকারের কর্মচারীদের প্রতি উপহার। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য কর্মচারী সমাজকে সজাগ ও সচেতন হতে হবে। □

অতীতকে ফিরে দেখা

প্রণব কুমার কর

সারা দেশের পাঁচটি রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী এপ্রিল ও মে মাস জুড়ে। তার মধ্যে আমাদের রাজ্যও রয়েছে। আমাদের রাজ্যে আগামী ৪ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত মোট ৬ দফায় ৭ দিন ধরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বর্তমানে আমাদের রাজ্যের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি, তাতে করে দীর্ঘ একমাস ধরে ৬ দফায় ভোট গ্রহণের ঘোষণায় কোনো মানুষই আশ্চর্য হননি। আমাদের রাজ্যে মধ্যবিত্ত কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব, মহিলা সমস্ত অংশের মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন বিগত পাঁচ বছরে মা-মাটি-মানুষের স্লোগানধারী সরকারের হাতে।

রাজ্যের মধ্যবিত্ত কর্মচারীরা ভীষণভাবে বঞ্চিত হয়েছেন বিগত পাঁচ বছরের তৃণমূল দলের সরকারের কাছে। অথচ পূর্বতন বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনে কর্মচারীরা অসংখ্যা দাবি দাওয়া সুযোগ-সুবিধা অর্জন করতে পেরেছিলেন। বিগত পাঁচ বছরে তৃণমূলের সরকারের আমলে সেই অর্জিত সুযোগ ও অধিকারের অনেকগুলিই খর্ব করা হয়েছে অথবা পুরোপুরি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কর্মচারী আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় এটা দেখা গেছে যে যখন বামপন্থীরা শক্তিশালী হয়, তখন শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার অর্জিত, রক্ষিত হয় বা সম্প্রসারিত হয়। আবার যখন বামপন্থীরা দুর্বল হয় তখন শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার খর্ব হয়। এমনকি সংগঠন করার অধিকারই লুপ্ত হয়। সে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেতন কমিশনের সিদ্ধান্ত রূপায়ণের সময়ও যা সত্য, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা অর্জনের ক্ষেত্রেও তা সত্য। স্মরণ করা যেতে পারে যে, যখন রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, তখন তিনিও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির স্বীকৃতি কেড়ে নিয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারে আসীন হয়েই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পাওয়ার অধিকার অর্জিত হয় ১৯৬৯ সালের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে যেখানে বামপন্থীরা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ শরিক ছিলেন। এই সুযোগ লুপ্ত হয়েছিল দীর্ঘ ৮ বছর—যখন বামপন্থীরা ক্ষমতায় ছিলেন না। রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকরা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা আবার হাতে পেয়েছিল ১৯৭৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে যখন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে তৃণমূল সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পাওয়ার অধিকার প্রহসনে পরিণত হয়েছে। কার্যতই এই অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কর্মচারীদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে বহু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ষাটের দশকে এবং সত্তরের দশকের আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের দিনগুলিতে বহু কর্মচারী আন্দোলনের নেতা, সংগঠক চাকুরি থেকে বরখাস্ত হয়ে গিয়েছিলেন সংবিধানের ৩১১(২) (গ) ধারা বলে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের সরকারে আসীন হয়ে সেই সমস্ত বরখাস্ত হয়ে যাওয়া কর্মচারী, নেতৃত্ব এবং সংগঠকদের চাকুরিতে পুনর্বহাল করেন। এঁদের মধ্যে অনেকে বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, এমনকি মারাও গিয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য বামফ্রন্ট সরকার এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যাতে করে তাঁরা অবসরকালীন সুযোগ সুবিধাগুলি পেতে পারেন এবং তাঁরা সেই সুবিধাগুলি পেয়েওছিলেন। ইতিপূর্বে যুক্তফ্রন্ট সরকারও অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৭৭ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাজ্যের কংগ্রেস সরকার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বহু কর্মচারীর চাকুরিগত সুযোগ-সুবিধাগুলিকে আটকে রেখেছিল। বহু কর্মচারীর পদোন্নতি আটকে রাখা হয়েছিল। চাকুরিতে স্থায়ীকরণ বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সমস্ত কর্মচারীদের হৃত সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি অতীত দিন থেকে কার্যকর করেছিল।

পূর্বতন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কংগ্রেস সরকার কর্মচারীদের ধর্মঘট করার ‘অপরাধে’ বেতন কেটেছিল, ব্রেক সার্ভিস পর্যন্ত করেছিল। বামফ্রন্ট সরকার সেই সমস্ত ধর্মঘটী কর্মচারীদের বেতন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং ব্রেক-সার্ভিসের আদেশগুলি রদ করে দিয়েছিলেন। বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ও পূর্বতন কংগ্রেসের সরকারের মতো ধর্মঘটী কর্মচারীদের বেতন কেটেছে এবং চাকুরি জীবন থেকে একদিন কেটে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ‘ডাইস-নন’ করেছে।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা ১৯৭৭ সালে প্রথম পুজোর ও ঈদের সময়ের বোনাস পেয়েছিলেন। সারা ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে প্রথম আমাদের রাজ্যের কর্মচারীরা এই অধিকার অর্জন করেছিলেন।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলের শুরুতেই ১৯৭৮ সালে প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বসার জন্য চেয়ার সরবরাহের আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৮০ সালে ব্রিটিশ আমলের উত্তরাধিকার সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস বাতিল করে, নতুন দায়িত্ব, কর্তব্য এবং অধিকার সংবলিত আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছিল। যে আদেশনামার মধ্য দিয়ে কর্মচারীরা সংগঠিত হওয়ার, সংগঠন করার, এমনকি ধর্মঘট করার অধিকার পর্যন্ত অর্জন করেছিল। বর্তমানে যা আক্রান্ত স্বৈরাচারী শাসকের হাতে।

১৯৭৯ সালের ২৫ জুনের অর্থ দপ্তরের ৬০৬০-এফ আদেশনামা মারফৎ তিন বৎসর কার্যকালের মেয়াদ শেষে চাকুরীতে স্থায়ীকরণের বিধি কার্যকরী হয়েছিল। এর পূর্বে কর্মচারীদের চাকুরিতে স্থায়ীকরণের এরকম ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমান সরকার তা কার্যত অগ্রাহ্য করছে। পরন্তু করণিক কর্মচারীদের চাকুরিতে স্থায়ীকরণের পূর্বে প্রতি বছর পরীক্ষায় বসার ফরমান জারি করেছে। অন্যথায় বা পরীক্ষায় ফেল করলে চাকুরিচ্যুতিও হতে পারে।

বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম বছেরেই, ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে কর্মচারীদের বেতন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ইতিপূর্বে একমাত্র যুক্তফ্রন্ট সরকার ছাড়া কোনোদিন কোনো সরকার কর্মচারীদের জন্য এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। শুধু রাজ্যের কর্মচারীরাই নয়, শিক্ষকরা, স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থার কর্মচারীরাও বামফ্রন্ট সরকারের আমলে চারটি বেতন কমিশনের সুযোগ পেয়েছিলেন। বর্তমানে বেতন কমিশন প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষতার লক্ষ্যে নিয়োগ নীতির পরিবর্তন ঘটেছিল বামফ্রন্ট সরকারের সময়। সিদ্ধান্ত হয়েছিল কর্মনিযুক্তি কেন্দ্র গঠন করে সেখান থেকেই সমস্ত দপ্তরের রিজিওন্যাল স্তরে নিয়োগ কার্যকরী হবে। এমনকি ২০০৮ সালে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল রিজিওন্যাল স্তরের সমস্ত পদে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। পূর্বের সমস্ত নৈরাজ্যমূলক,

● *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)*

স্বাস্থ্যে উৎসব নয়, চলছে খেলা স্বাস্থ্যের বেহাল অবস্থা

কুমকুম মিত্র

এই রাজ্যের সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা এই মুহূর্তে একটা বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বিগত কয়েক বছর ধরে একের পর এক পরিকল্পনাহীন অবাস্তব সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতেই বর্তমানের এই বিপর্যস্ত অবস্থা। প্রায় তিন দশকের ওপর ধরে পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকারের তৎপরতার ফলে এ রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর মানুষের আস্থা যে ক্রমশ বেড়েছিল তার প্রমাণ সরকারী পরিসংখ্যানেই প্রতিফলিত—প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ তাদের স্বাস্থ্যের জন্য সরকারী পরিষেবার উপর নির্ভরশীল। আমরা জানি স্বাস্থ্যসূচকগুলি খুবই সংবেদনশীল এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার মান ও ব্যাপ্তি উভয়ের ওপরই নির্ভরশীল, সাথে সাথে এই পরিষেবার মান নির্ণয়ের সূচকও। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে আমাদের রাজ্যে এই স্বাস্থ্য সূচকগুলির ক্রমোন্নতি আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু বিগত প্রায় পাঁচ বছরে যে তা আরো উন্নত করা যায়নি, বরং কয়েকটি ক্ষেত্রে অবনতিই হয়েছে তা স্পষ্ট।

❏ জন্মহারের ক্ষেত্রে যতটা উন্নতি করা সম্ভব ছিল তা হয়নি। মৃত্যুহারে অবনতি তো স্পষ্ট এবং সর্বভারতীয় ক্রমপর্যায়ে আমরা প্রথম থেকে তৃতীয়তে নেমে এসেছি। শিশুমৃত্যু হারেও বিশেষ উন্নতি হয় নি, বিশেষত সর্বভারতীয় সূচকের তুলনায়। সদ্যোজাত শিশুমৃত্যু ও ৫ বছরের কমবয়সী শিশুমৃত্যুর ক্ষেত্রেও আমরা পিছিয়ে পড়েছি।

❏ স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কেন আজ স্বাস্থ্যের এই হাল? এই কয়েক বছরে কি এমন হল যার জন্য আমরা পিছিয়ে পড়ছি? খবরের শিরোনামেও বার বার উঠে আসছে পরিকাঠামোর বেহাল দশা। নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত প্রতিদিন বিভিন্ন সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মানুষের মনে আশা জাগিয়ে নিত্য নতুন মাল্টিস্পেশালিটি / সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের দ্বারোদঘাটন, সমস্ত পর্যায়ের পরিষেবা ফ্রি ইত্যাদি ঘোষণা করে গেছেন। এই সমস্ত হাসপাতালগুলির যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অন্যান্য সাধারণ বিভাগের সাথে ইউরোলজি, নিউরোলজি, কার্ডিওলজির মতো বিশেষ বিশেষ বিভাগগুলি থাকবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলির কিছুই নেই। এর সাথে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি তা হল—শুধু টাকা খরচ করে বড় বড় বিল্ডিং বানালেই তো হল না। এই হাসপাতালগুলিকে কার্যকরী করতে এবং প্রতিশ্রুতি মতো মানুষকে সঠিক পরিষেবা দিতে প্রয়োজন—চিকিৎসক, নার্সিং কর্মচারীসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কোনো নতুন করে চিকিৎসক, নার্স নিয়োগ হয়নি। শুধুমাত্র চুক্তির ভিত্তিতে কিছু গার্ড, সুইপার, গ্রুপ ডি নেওয়ার নির্দেশিকা বেরিয়েছে। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে স্থায়ীপদের অবলুপ্তির দিকেই যাচ্ছে সরকার। চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীর ক্রমবর্ধমান অপ্রতুলতা, অর্থের অপচয়, কর্মক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতার ফলেই স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো ভেঙে পড়ছে।

❏ গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল আরো করুণ। গত বছরে বিধানসভায় পেশ করা একটি সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী (তথ্যসূত্র ঃ এই সময় ১৭ জুন, ২০১৫) রাজ্যের ৯০৯টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের (P.H.C) মধ্যে ৫২৬টিতে কোনো শয্যা নেই। সম্প্রতি যদিও কয়েকটি পি.এইচ.সি-তে শয্যার উদ্বোধন করেছেন, কিন্তু কর্মীর অভাবে তা কার্যকরী হচ্ছে না সঠিকভাবে। ৩২০টি P.H.C-তে কোনো ডাক্তার নেই। ৩৪৭ জন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের (B.M.O.H) পদে রয়েছেন মাত্র ১৯৭ জন, এখনো ১৫০টি পদ শূন্য আছে। ২৭৮৫টি জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার পদের ১২৬৯টিতে কোনো ডাক্তার নেই। এ বছরে হেলথ্ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ৩১৬৫টি জি. ডি. এমও শূন্যপদে দরখাস্ত আহ্বান করেছেন, তার মধ্যে দরখাস্ত জমা পড়েছে মাত্র ১৯০০টি। অর্থাৎ ডাক্তাররাও কেউ মানসম্মান বিকিয়ে এই প্রশাসনের অধীনে কাজ করতে নারাজ। কারণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন না, চলতে হবে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতোই, অন্যথায় কোনো প্রতিবাদ করলেই বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করবে, বা ঝুলবে শাস্তির খাঁড়া, বদলী, সাসপেনশন, বরখাস্ত ইত্যাদি। যে কারণে এ রাজ্যে শ্যামাপদ গড়াইয়ের মতো ডাক্তারকেও সাসপেন্ড করা হয়।

❏ বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবার আরো একটি নমুনা সরকার পক্ষের মন্ত্রী-আমলা-বিধায়করা ভুলেই যান কোনটা মানুষের আর কোনটা পশুর হাসপাতাল। তাই তো শুধুমাত্র গায়ের জোরেই ডাঃ নির্মল মাঝির নির্দেশে রাজ্যের অন্যতম প্রধান হাসপাতাল এস এস কে এম-এ একজন বিধায়কের কুকুরের ডায়ালেসিস করায় রাজি হন হাসপাতালের সুপার। রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদে তা যদিও করা হয়নি।

❏ বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবায় সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ে জনসংখ্যার সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশ—মা ও শিশুরা। হাসপাতালে প্রসবের সংখ্যা গত তিন বছরে ধারাবাহিকভাবে কমেছে। ২০১১-১২-তে ছিল ৪,২৬,৬১১, ২০১২-১৩-তে ৪,০৪,২৪০ এবং ২০১৩-১৪-তে তা পৌঁছালো লজ্জাজনক সংখ্যায় মাত্র ২,৮০,৬৩৪। এর সাথে সাযুজ্য রেখে কমেছে জননী সুরক্ষা যোজনায় উপভোক্তার সংখ্যা। ২০১১-১২-তে ৭,৮৭,৬০৪, ২০১২-১৩-তে ৬,৫৯,৯৯৬ এবং ২০১৩-১৪-তে কমে দাঁড়ায় প্রায় অর্ধেক মাত্র ৩,৬৩,২৮২ জন। এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট—কেন সদ্যোজাত শিশুমৃত্যুর হার, ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার ও প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যুর হার সূচক গত তিন বছরে উন্নত না হয়ে তুলনামূলকভাবে অবনতি হয়েছে।

❏ অথচ বামফ্রন্টের সময়ে হাসপাতালে প্রসব ও জননী সুরক্ষায় উপভোক্তার সংখ্যা একটি উল্লেখযোগ্য স্থানে ছিল। যার ফলে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার ছিল ক্রমহ্রাসমান। বর্তমান সরকার যখন দেখলো কলকাতাসহ জেলায় জেলায় শিশুমৃত্যু হার বেড়ে যাচ্ছে তখন এই শিশুমৃত্যু কমানোর লক্ষ্যে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে একজন কর্পোরেট স্বাস্থ্যজগতের শিশু বিশেষজ্ঞকে মাথায় বসিয়ে একটি হাই পাওয়ার কমিটি করেছিল। এই কমিটি প্রচুর অর্থ ব্যয়ে ঝাঁ চকচকে অজস্র সিক-নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট (S N C U) রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে খুলে দিলেন। কিন্তু সেই একই সমস্যা—ব্যবস্থা হল না কোন ডাক্তার-নার্সের। লাগোয়া হাসপাতাল থেকেই ডাক্তার-নার্স তুলে নিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়াই বাধ্য করানো হচ্ছে এইসব ইউনিটে কাজ করতে। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন জেলা / মহকুমা হাসপাতালগুলিতে যেমন পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কর্মচারীর ঘাটতি হচ্ছে; মানুষ ঠিক মতো পরিষেবা পাচ্ছে না, তেমন এস এন সি ইউ সহ নতুন নতুন ইউনিটগুলিতেও সঠিক পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে না। তার ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দুর্ঘটনা হাসপাতালগুলিতে ঘটে যাচ্ছে, যা কাঙ্ক্ষিত নয়। সাধারণ মানুষও প্রকৃত সত্য না জানায় ডাক্তার-

● *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)*

মাথা উঁচু করে বাঁচা যাবে না

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

বদলী। পরিকাঠামো ছাড়াই চালু হচ্ছে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল। একমাত্র সরকারী সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে কুকুর ডায়ালিসিসের জন্য হাজির।

সামাজিক জীবনে দুর্নীতি চেপে বসছে। সারদা-রোজভ্যালির রমরমা। কারুর কারুর মতে ১ লক্ষ কোটি টাকা জনসাধারণের কাছ থেকে তুলে চিটফান্ড সংস্থাগুলিতে প্রতারিত প্রায় ২.৫ কোটি সাধারণ মানুষ। আত্মহত্যা করেছেন প্রায় ৭০ জন। তারপর প্রশ্নপত্র ফাঁস, টেট কেলেঙ্কারি, গমবীজ কেলেঙ্কারি, এস.জি.ডে.এ কেলেঙ্কারি আরও কত?

সরকারী দপ্তরে স্থায়ী চাকরি কই? সাড়ে তিন লক্ষ শূন্যপদে স্থায়ী চাকরি কই? ষাট-উর্ধ্ব যুবক পুনর্নিযুক্ত হচ্ছেন লজ্জার মাথা খেয়ে, পি এস সি-কে ঠুঁঠো জগন্নাথে পরিণত করা হচ্ছে। হাজার হাজার যুবক-যুবতী নিযুক্ত হচ্ছে চুক্তিতে। কোনো টাইম-স্কেল নেই, বার্ষিক বৃদ্ধি নেই, ছেদহীন ভাবে কাজের সুযোগ নেই। নেই সামাজিক নিরাপত্তার জন্য কোনো টার্মিনাল বেনিফিটের সুযোগ। শুধু আছে প্রলোভন, প্রতারণা।

পশ্চিমবাংলায় নারীদের সম্মান আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। পার্কস্ট্রীট, কামদুনি, মধ্যমগ্রাম, কাটোয়া, আমতা, ধূপগুড়ি সহ সমগ্র রাজ্যে অজস্র ঘটনা ঘটেছে। আতঙ্ক আর হাহাকারে মূর্ছিত আকাশ। মধ্যবিত্ত মানুষ হিসাবে আজ আমরা এক দমবন্ধকরা পরিস্থিতির মুখোমুখি।

পশ্চিমবাংলার কর্মচারী আন্দোলনের জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা হল—অনুকূল পরিস্থিতি ছাড়া রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা কোনো বুনিয়াদী দাবি অর্জন করতে পারে নি। তা ১৫ শতাংশ হারে বাড়ীভাড়া ভাতাই হোক (১৯৬৭), কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতাই হোক (১৯৬৭), ১৯৬৯ এবং ১৯৭৯ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত) আর পে-কমিশনই হোক (১৯৬৭ বেতন কমিশন ১৯৭০ সালে হিমঘরে পাঠিয়ে কংগ্রেস আমলে ঘোষ-কুন্ডু কমিটি, ১৯৮১, ১৯৯০, ১৯৯৮ ও ২০০৯)। ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম, মৃত কর্মচারীর পরিবারের পোষ্যের চাকরি, হেলথ স্কীম '০৮ ইত্যাদি আরও কত। আর তাই দাবি অর্জনের জন্য অধিকার রক্ষার জন্য, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চাই পরিস্থিতি পরিবর্তন। পরিবার-পরিজন সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নেওয়া প্রয়োজন সদর্থক সিদ্ধান্ত। আমাদের সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যতের জন্য চাই নতুন পরিস্থিতি। তা সম্ভব লড়াই শুরু হয়েছে ঘরে-বাইরে। গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ সমবেত হচ্ছেন পরিস্থিতির পরিবর্তনের সংগ্রামে। খেয়ালে রাখা প্রয়োজন ভূপেন্দ্রনাথ হাজারিকা বনাম স্টেট অফ আসাম অ্যান্ড আদার্স মামলায় সুপ্রীম কোর্টের সেই তাৎপর্যবাহী পর্যবেক্ষণ, "... It should always be borne in mind that legitmate aspirations of the employees are not guillotined and a situation is not created where hopes in despair. Hope for everyone is gloriously precious and a model employer should not convert it to be deceitful and treacherous by paying a game of Chess... An atmosphere of trust has to prevail and when the employees are absolutely sure that their trust shall not be betrayed and they shall be treated with dignified fairness then only the concept of good governance can be concretized."...

যে সরকার সে কথা শোনে না, প্রচলিত নিয়ম-কানুন মানে না সম্মানজনক ন্যায়সম্মত বিবেচনা করতে পারে না—কি উপায় সেখানে? তাই দিকে দিকে প্রস্তুতি গড়ে তুলুন। অভূতপুর্ব চেপে বসা আতঙ্কজনক এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের সংগ্রামে আমরা সামিল হই। সপরিবারে, আমরা সবাই।

আমাদের আরও উপলব্ধি করা প্রয়োজন রাজ্যে পরিস্থিতির পরিবর্তনের এই সংগ্রামের তাৎপর্য শুধুমাত্র রাজ্যের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ নেই। জাতীয় ক্ষেত্রে উগ্র হিন্দুত্ববাদী শক্তির আস্ফালন অর্থনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ বিপদের বীজ বপন করছে, সেগুলি অঙ্কুরিত হওয়ার আগেই উৎখাত করার লড়াইকে শক্তিশালী করাও এই সংগ্রামের অন্যতম তাৎপর্য। জাতীয় স্তরের লড়াইকে শক্তিশালয় করার স্বার্থেও এ রাজ্যের বুকে স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির পরাজয় জরুরি। □

ফিরে দেখা

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

স্বজন পোষণের নিয়োগের নীতি বাতিল করার ফলে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীরা আশার আলো দেখেছিলেন সরকারী চাকুরিতে নিয়োগের প্রশ্নে। বর্তমান সরকারের আমলে আমরা নিয়োগের ক্ষেত্রে দেখছি এক চূড়ান্ত অস্বচ্ছতা, অসততা, তোলাবাজী, দলবাজী, স্বজনপোষণ নীতি।

প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মরত কর্মচারীদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার জন্য বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট (ACR) পেশের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ১৯৮০ সালে বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারীদের গোপন রিপোর্ট পেশের আদেশ পরিবর্তন করে প্রকাশ্য রিপোর্ট পেশের আদেশনামা প্রকাশন করেছিলেন।

বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে বিভিন্ন ক্যাডারের পদোন্নতি সংক্রান্ত কর্মচারী স্বার্থসংশ্লিষ্ট অসংখ্য আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন করণিক কর্মচারীদের ১ ঃ ১ অনুপাতে নিম্নবর্গীয় করণিক থেকে উচ্চবর্গীয় করণিক পদে পদোন্নতি এবং পরবর্তীকালে মোট করণিক কর্মচারীর অনুপাতে ১০ শতাংশ প্রধান করণিকের পদ সৃষ্টি হয়েছিল। এ ছাড়াও প্রাক্ করণিক (Typist) পদের কর্মচারীদের জন্য ৫ ঃ ৪ ঃ ১ অনুসারে পদোন্নতির আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছিল। এইভাবে বিভিন্ন ক্যাডারের উন্নততর পদন্নোতির আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছিল।

এছাড়াও কর্মচারীদের আরও পদোন্নতির বা বেতন বৃদ্ধির সুযোগের জন্য ১০ বছর পর এবং ২০ বছর পর বেতন স্কেলের পরিবর্তনের আদেশ হয়েছিল। পরবর্তীকালে একে ৮ বছর, ১৬ বছর এবং ২৫ বছর পর বেতন স্কেলের পরিবর্তনের উন্নততর আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছিল। এর ফলে অসংখ্য কর্মচারীর প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছিল।

বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে অসংখ্য ক্যাডারের বেতন স্কেলের পরিবর্তন করে উচ্চতর বেতন স্কেলে উন্নীত করা হয়েছিল। সবটাই হয়েছিল সুনির্দিষ্টি নীতির ভিত্তিতে। বর্তমান সরকার কর্মচারীদের পরিবর্তে আধিকারিকদের বেতন স্কেল উন্নীত করছেন। তেলা মাথায় তেল দেবার নীতি নিয়ে চলছেন।

পূবর্তন সরকারের সময়কালে অসংখ্য অনিয়মিত কর্মচারী যেমন মাষ্টার রোল, ওয়ার্ক চার্জড, রিজিওন্যাল প্রভৃতি কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করে রেগুলার এস্টাব্লিসমেন্টে নিয়ে আসা হয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই এ সংক্রান্ত আদেশনামাটিকে রদ করে দেয়। এখন স্থায়ী পদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে চুক্তি প্রথায় নিয়োগ নিয়মে দাঁড়িয়েছে।

আজকের দিনে চিকিৎসা ব্যয় অত্যাধিক বেশি হয়ে যাওয়ায় বামফ্রন্ট সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের চিকিৎসা ব্যয় মেটানোর জন্য যে স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প গ্রহণ করে তা সারা ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকল্প হিসাবে বিবেচিত হয়। বর্তমান সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এই স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পকে বিভিন্নভাবে বিচলিত করার চেষ্টা করছে। □

স্বাস্থ্যের বেহাল অবস্থা

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

নার্সের ওপর দুর্ঘটনার দায় চাপিয়ে আক্রমণ নামিয়ে আনছে।

❑ দুঃখের হলেও সত্যি—বিগত তিন-চার বছরে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে সীমাহীন অবহেলা করা হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন পরিকল্পনার অধীনে ASHA কর্মী এবং ANM(R) নিয়োগ হলেও পরিকাঠামোর কোনো উন্নতি হয়নি। রাজ্যে মোট সাবসেন্টারের সংখ্যা ১০৩৫৬টি। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে আরো ১০০০টি সাবসেন্টার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু মা-মাটি-মানুষের(?) সরকার ক্ষমতায় এসে একটিও সেন্টার বৃদ্ধি করেনি। শুধুমাত্র সাইকেল, ছাতার লালিপপ ধরিয়ে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। এদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যায় কাজের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে, কর্মচারীদের নাভিশ্বাস উঠছে, ক্ষোভও বাড়ছে। সম্প্রতি গত ৯ মার্চ '১৬ 'জাতীয় অ্যালবেন্ডাজোল দিবস' (NAD) প্রোগ্রাম রাজ্য জুড়ে আলোড়ন ফেলেছে। মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দপ্তরের পরিকল্পনাহীন সিদ্ধান্তের জন্য জেলায় জেলায় বিশেষত তিনটি জেলায় (হাওড়া, মেদিনীপুর ও দঃ ২৪ পরগনা) কয়েক হাজার স্কুল পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। অ্যালবেন্ডাজোল ওষুধ সাধারণত ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এবং মূলত রাত্রিবেলায় খাওয়া উচিত। কিন্তু স্কুল টিচার, অঙ্গনওয়ারী ও আশা কর্মীদের মাধ্যমে এই গরমে দুপুর বেলাতেই ওষুধ খাওয়ানোর বাধ্যতামূলক নির্দেশিকা জারি হয়। অদ্ভুতভাবে ও স্বভাবসিদ্ধভাবেই রাজ্যের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিষয়টিকে 'সামান্য ঘটনা' বলেই ভূষিত করেন।

❑ শিশুদের ভিটামিন 'এ' অয়েল (যার অভাবে রাতকানা রোগ হয়)-এর ডোজ বামফ্রন্টের সময়ে ২০১০-১১ সালে ছিল ১০০ শতাংশের ওপর। ২০১৩-তে কমে হয় ৫৮.৩৯ শতাংশ। রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে (চোখের) ছানি অপারেশন যা ২০১০ সালে ছিল ১০২.৪ শতাংশ, ২০১৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৬৫.৮ শতাংশ।

□ ডেঙ্গুতে মৃত্যুর হার বেড়েছে। ২০১০ সালে কলকাতায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৪৩৭ জন। ২০১২ সালে আক্রান্তের সংখ্যা এক লাফে বেড়ে হয় ৩৩৬১ জন ও মৃত্যু হয় ১১ জনের। অ্যাকিউট এনকেফেলাইটিসে ২০১৩ সালে মৃত্যু হয় ১৬ জনের। আবার জাপানী এনকেফেলাইটিসে ২০১৩ সালে আক্রান্তের সংখ্যা ২১২ জন। সামাজিক স্বাস্থ্যও যে এ রাজ্যে কতটা বিপর্যস্ত তা এই উদাহরণগুলি থেকেই বোঝা যায়। এমনই এক কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এ রাজ্যের গরিব সাধারণ মানুষকে।

❑ স্বাস্থ্যর এই ভয়ঙ্কর অবস্থার জন্য দায়ী রাজ্যের অর্থনৈতিক বরাদ্দও। স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ কমেছে ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে। ২০১৪-১৫ সালে স্বাস্থ্য বাজেটের তুলনায় ২০১৫-১৬ সালে বরাদ্দ কমেছে প্রায় ৫০ কোটি টাকা।

❑ ফেয়ার প্রাইস শপ বা ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান, এটা যে মুখ্যমন্ত্রীর কত বড় ধোঁকা তা রাজ্যের মানুষের কাছে এখন পরিষ্কার। একবুক হতাশা নিয়ে রাজ্যের মানুষকে সহ্য করতে হচ্ছে এই ধোঁকাবাজি। কোনো ওষুধই ন্যায্য মূল্যে বা বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে না। ফেয়ার প্রাইস শপের মাধ্যমে ব্র্যান্ডেড ওষুধ যে দামে বিক্রী হচ্ছে তার থেকে অনেক কম দামে সেই ওষুধ বাজারে পাওয়া যায়। ডাক্তাররা লিখছেন জেনেরিক নাম আর ফেয়ার প্রাইস শপে বিক্রী হচ্ছে ব্র্যান্ডেড ওষুধ। সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরের ক্যাটালগভুক্ত ওষুধ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম বিক্রী হচ্ছে এইসব দোকানে। দাম বা এম আর পি নিয়েও ওষুধ কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে শহর থেকে গ্রামে গঞ্জে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রামীন হাসপাতাল পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা ফ্রি ছিল। বর্তমান শাসকদল ক্ষমতায় এসে পি পি পি মাধ্যম বাদ দিয়ে সর্বক্ষেত্রেই চিকিৎসা ব্যবস্থা ফ্রি বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু তার কোনো পরিকাঠামোই গড়ে ওঠে নি। গত ৩০ নভেম্বর ডাক্তারদের বাইরে থেকে ওষুধ কেনার প্রেসক্রিপশনের ওপর জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। ফলে ইচ্ছা থাকলেও রোগীরা বাইরে থেকে ওষুধ, সরঞ্জাম কিনতে পারছে না। এক কথায় বলা যায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে নিয়ে এক চরম স্বেচ্ছাচারী খেলায় মেতে উঠেছে, যার পরিবর্তন প্রয়োজন।

তাই প্রশ্ন হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে কেন এই খেলায় মেতে উঠলেন? রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করতে শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী করে যাচ্ছেন, তবুও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে না, হচ্ছে না রাজ্য স্বাস্থ্যবতী, তবে কেন এই ধোঁকাবাজি, কেন এই প্রহসন। কেন প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরিবর্তে শাসকদলের মনোনীতদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হয়েছে? কেন সরকার বেসরকারী ডাক্তারদের নিয়ে আসছে প্রশাসনের মাথায়? স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে এই স্বেচ্ছাচারিতা, দ্বি-চারিতা, রাজনৈতিক ধোকাবাজির জবাব দেওয়ার সময় এসেছে। জবাব দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের সঠিকভাবেই পালন করতে হবে আসন্ন সংগ্রামে। □

শোক সংবাদ

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রণী সংগঠক, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের প্রাক্তন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কমরেড ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয়েছে। তাঁর স্ত্রী ও এক পুত্র বর্তমান। গত ২১ মার্চ ভোরে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারী নার্সিংহোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হবার পর ২০ মার্চ তাঁকে ঐ নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। সুবক্তা, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও চিত্রশিল্পী—একাধিক গুণসম্পন্ন কমরেড ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। আইএ পাশ করার পর তিনি ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের ফাইন আর্টস বিভাগে পাঁচ বছরের পাঠক্রম শেষ করে ছবি আঁকার জগতে প্রবেশ করেন। ঐ একই সময়ে যুক্ত হন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও বামপন্থী আন্দোলনে।

সাতের দশকে কমরেড জ্যোতি বসুর আহ্বানে সংস্কৃতি কর্মীদের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অপরিসীম অবদান ছিল।

ছবি আঁকা ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার পাশাপাশি তিনি নাট্যকার হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর লেখা নাটক মহাভারতের যুদ্ধ, শেতলার দয়া, অভিযান, কার্ল মার্কস প্রভৃতি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এছাড়াও পরশুরাম ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসেরও নাট্যরূপ দেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত সংগঠনের মুখপত্রে বিভিন্ন সময়ে তাঁর লেখা ও আঁকা ছবি প্রকাশিত হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে কমরেড ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। □

বিনা মন্তব্যে

● **তৃণমূলকে জেতাতে ক্লাবের কাছে আর্জি ঃ**

—ক্ষমতায় এসে গুচ্ছ গুচ্ছ ক্লাবকে অনুদান দিয়েছে তৃণমূল সরকার। পাঁচ বছর পরে বিধানসভায় ভোটের আগে ঘুরপথে সেই ক্লাবগুলির কাছেই তৃণমূলকে জেতানোর আবেদন করলেন দলীয় সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।—**আঃ বাঃ পঃ ২৯ ফেব্রু. ঃ ২০১৬ সোমবার।**

● **যাদবপুরকে দেশ ভক্তির পাঠ দেবেন বিজয় বর্গীয় ঃ**

—এদিন আসানসোলে এক কর্মী সভায় বিজেপি-র ওই কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, "বিধানসভা ভোটে জিতে আমরা সরকার গড়তে পারলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়সহ যেখানেই দেশ বিরোধী স্লোগান উঠবে, যারা এই স্লোগান দেবে, তাদের লাথি মেরে বার করে দেব।"—**আঃ বাঃ পঃ ২৮ ফেব্রু. ঃ ২০১৬ রবিবার।**

● **আটকে ছিলেন তখন, ফলাও প্রচারে এখন ঃ**

—বিরোধী আসনে বসে যে প্রকল্প বন্ধ করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন, ভোটের মুখে সেটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সাফল্যের অন্যতম মুখ। প্রকল্পের নাম 'বনরিনি'। মাত্রই ক'দিন আগেই যে নাম দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। উত্তর কলকাতার শহরতলি বনহুগলীতে উদ্বাস্তুদের জন্য তৈরি আবাসন—**আঃ বাঃ পঃ ২৯ ফেব্রু. ঃ ২০১৬ সোমবার।**

● **বাগান ভালো চললে কেন্দ্র নাক গলাত না, ইঙ্গিত চেল্লুরের ঃ**

—মামলার শুনানির সময়ে কোনো রায় না দিলেও ডানকানের কাছে প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, "সব কিছু ঠিকঠাক চললে কেন্দ্রকে চাবাগানগুলির উপর হস্তক্ষেপ করতে হবে কেন?—**আঃ বাঃ পঃ ২৭ ফেব্রু. ঃ ২০১৬ শনিবার।**

● **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করলেন, তাঁর কাজ গবেষণার বিষয় হয়ে গিয়েছে**

—এদিন ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন "এত অল্প সময়ে এত কাজ কেউ কোনোদিন করতে পারবে কিনা, আমার সন্দেহ আছে। এটা নিয়ে গবেষণার দরকার। আমার সরকারের কাজ গবেষণার বিষয় হয়ে গিয়েছে।—**আঃ বাঃ পঃ ২৭ ফেব্রু. ঃ ২০১৬ শনিবার।** □

আর এস এস-বিজেপি

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

চিকিৎসক ক্রমশ সমাজ সেবায় যুক্ত হন দাভোলকর। পরে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার নির্মূলীকরণের আন্দোলনে যুক্ত হন এবং অখিল ভারতীয় অন্ধ শ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। পরে মহারাষ্ট্রে এই সংগঠন তৈরি করেন। ২০১০ সালে মহারাষ্ট্র অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি কুসংস্কার এবং কালো জাদু বিরোধী বিলের আবেদন করে। তা আন্দোলনের চেহারা পায়। শিবসেনা, বিজেপি বিরোধিতা করে বলেছিল, তুকতাক-কুসংস্কার বিরোধী ওই বিল পাশ হলে নাকি হিন্দু সংস্কৃতিতে আঘাত লাগবে। নানা হুমকিকে পরোয়া করেননি দাভোলকর। ২০ আগস্ট, ২০১৩ আততায়ীর গুলিতে নিহত হন নরেন্দ্র দাভোলকর। □

কামদুনি ঃ প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধ

শাশ্বতী মজুমদার

বাংলার ‘নির্ভয়া’ বলে কামদুনির ধর্ষিতা কলেজ ছাত্রীকে অভিহিত করেছিল সাংবাদমাধ্যম। দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা দুটি মেয়েই শিক্ষার আলোক রেণুতে সূর্যমুখী হতে চেয়েছিল। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছিল মানুষ হিসাবে। মেয়েদর জন্য সমাজ যে গন্ডি কেটে রেখেছে সেই লক্ষ্মণরেখা পার হবার সাহস দেখিয়েছিল। প্রতিক্রিয়ার থাবায় ছিন্নভিন্ন তাদের দেহে। কালো হয়ে জমাট বেঁধে থাকা রক্তের অক্ষরে বর্বরতার লিখন — ‘নিয়মভাঙার ঔদ্ধত্যের এই হল সমুচিত জবাব’। যাতে ঘরে ঘরে সূর্যমুখীদের বাইরের জগৎকে জয় করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার সাহস না হয়। যাতে তাদের বাপ-মায়েরা নিজেদের মেয়েদের দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণা থেকে বাঁচাতে তাদের জন্য বাইরের দোর বন্ধ করে শুধুই ঘরাকন্নার জীবনে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন।

সংগঠনের সংবর্ধনা মঞ্চে কামদুনির দুই সাহসী মুখ টুম্পা কয়াল ও মৌসুমী কয়াল

২০১৩ সালের ৭ জুন উত্তর ২৪ পরগনার কামদুনির গ্রামে যে শান্ত মেয়েটি কলেজে পরীক্ষা দিয়ে ফিরছিল, কি ছিল তার অপরাধ? কেউ ভাবতে পেরেছিল ফেরার পথে ২০ বছরের শিপ্রাকে জোর করে একটা বন্ধ কারখানার মধ্যে ধরে নিয়ে গিয়ে ন’জন মিলে লুব্ধ কুকুরের মতো তার ছোট্ট শরীরটা নিয়ে প্রমত্ত উল্লাসে মেতে উঠবে? আর তারপর তার দুই পা ধরে নাভিমূল পর্যন্ত চিরে, গলার নলী কেটে তাকে ভেড়িতে ফেলে দিয়ে চলে যাবে? এই বীভৎস ধর্ষণ এবং হত্যাকান্ড নিষ্ঠুরতায় যেমন নির্ভয়া কান্ডের সমগ্রোত্রীয় তেমনই দুটি ক্ষেত্রেই ধর্ষকরা নিজেরাও দরিদ্র পরিবারের প্রতিভূ, তারাও কারও ছেলে-ভাই বা বাবা হওয়া সত্ত্বেও, নিজেরাই নিজেদের সব পরিচয় নস্যাৎ করে হয়ে উঠেছে ধর্ষক—নয়া উদারবাদী বিকারের ভয়াবহ নমুনা। পুঁজিবাদী সমাজের দেহে অনিরাময়যোগ্য ক্ষতের থেকে নির্গত পুঁজের মতো তাদের দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে।

‘নির্ভয়া’ ঘটনার সঙ্গে সব থেকে বড় সাদৃশ্য কামদুনির ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় তা হল দুটি ক্ষেত্রেই ধর্ষিতার মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু শোক-ক্রোধ-ঘৃণা জন্ম নিয়েছে মানুষের মধ্যে প্রতিবাদী মানসিকতার। প্রতিবাদী আন্দোলনের রূপে যা নাড়া দিয়ে গেছে। কিন্তু নির্ভয়ার সঙ্গে কামদুনির পার্থক্য হল শুধু গণধর্ষণেই আক্রমণের চেহারা থেমে থাকেনি। শাসকদলের মদত নিয়ে তা পরবর্তী আক্রমণে স্তব্ধ করতে চেয়েছে প্রতিবাদী শক্তিকে। এখানেই কামদুনিকাণ্ডের ভয়াবহতা সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে। এই রাজ্যের এক বিশেষ পরিস্থিতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। টুম্পা কয়াল ও মৌসুমী কয়াল যেমন একদিকে হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের মুখ। গোটা কামদুনির মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন গ্রামের মেয়ের ন্যায়বিচারের জন্য তাঁরা লড়াই করতে প্রস্তুত। অন্যদিকে ন্যয়বিচারের পথ সুগম করার জন্য, সুরক্ষার সুনিশ্চয়তা প্রদানের জন্য যে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ তৈরি করা দরকার, তার গুরুদায়িত্ব থাকে যে প্রশাসনের হাতে তা নিষ্ক্রিয় থেকেছে শাসকদলের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। আর প্রশাসনিক প্রধান যখন ন্যায় বিচার প্রার্থীর শত্রুজ্ঞানে আক্রমণ করে তাদের বিরোধী রাজনৈতিক তকমায় দেগে দেন, সেই অভূতপূর্ব দৃশ্যই বলে দেয় পুলিশ প্রশাসন ধর্ষকদের পক্ষেই কাজ করছে এবং প্রশাসন পরিচালনা করে যে রাজনৈতিক শক্তি তা কত নিবিড়ভাবে দুর্বৃত্ত-ধর্ষকদের সঙ্গে জড়িত সেটাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফলে লড়াইটা শুধু ধর্ষণের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচারের জন্যই নয়, ন্যায় বিচারকে যারা প্রতিহত করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছে। এইখানে কামদুনির সঙ্গে মিল পার্কস্ট্রীটের, কাটোয়ার ফালাকাটার, ধূপগুড়ি, আমতার, কাকদ্বীপের এবং এই রাজ্যে গত পাঁচ বছর ধরে ঘটে চলা আরও অজস্র ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার। প্রতিটি জায়গায় আক্রান্ত মহিলা, শিশু বা তাদের পরিবার সুরাহা চেয়ে পায়নি, উপরন্তু হুমকি-শাসানি-প্রলোভনের হাতছানি উপেক্ষা করে ন্যায় বিচারের লড়াই চালাতে হচ্ছে।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর সাম্প্রতিকতম তথ্য বলছে মহিলারা সবচেয়ে কম সুরক্ষিত যে রাজ্যগুলিতে তার শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ এবং তারপরই দ্বিতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলিতে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ পশ্চিমবঙ্গের থেকে কম। উত্তরপ্রদেশে ২০১৪ সালে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নথিভুক্ত অপরাধের সংখ্যা ছিল ৩৮, ৪৬৭, আর পশ্চিমবঙ্গে তা ৩৮, ২৯৯। ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ছিল ২৯,৪২৬। অর্থাৎ সারা দেশে যখন মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের বৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় ১০ শতাংশ হারে তখন এ রাজ্যে মহিলাদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার বৃদ্ধির হার ২৮ শতাংশের বেশি। একথা খুব নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, রাজ্য যারা চালাচ্ছেন তারা নারীর অসম্মানকে রোধ করতে চাইলে গত ৫ বছরে নারীর প্রতি অপরাধের এই ক্রমান্বয়ে স্ফীতি সম্ভব ছিল না। জুলাই ১২, ২০১৩-তে ফ্রন্টলাইন পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেছিলেন, “পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। আমরা পুলিশের ওপর দ্রুত আস্থা হারাচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন আমাদের পরিবারের মহিলা এবং শিশুদের এইসব নেকড়ে যারা কোনো আইনকানুন মানে না এবং সুস্থ পরিবেশ ধ্বংস করছে তাদের হাত থেকে আমাদের নিজেদেরই বাঁচাতে হবে।”

সাধারণ মানুষের অসহায়তার নিদারুণ চিত্র তুলে ধরেছে তাঁর বক্তব্য। কিন্তু তাঁরা প্রতিকারের উপায় খুঁজতে সংঘবদ্ধ হয়েছেন এটা তার থেকেও বড় সত্য। দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে জয় এসেছে—অতিরিক্ত জেলা এবং দায়রা আদালতের বিচারক সঞ্চিতা সরকার রায় ঘোষণার সময়ে ‘বিরলের মধ্যে বিরলতম’ ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬(ডি) (গণধর্ষণ), ৩০২, ৩৭৬(এ) (মহিলাকে এমনভাবে আঘাত করা যে কারণে তার মৃত্যু হয়) প্রভৃতি ধারায় বিচারে অভিযুক্তদের সাজা ঘোষিত হয়েছে। ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। তিন জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, দুজন প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস হয়েছেন, একজন বিচার চলাকালীন মারা গেছিল। এই দীর্ঘ বিচারপর্বে লড়াইয়ে সামনের সারিতে ছিলেন যে দুই গৃহবধূ টুম্পা এবং মৌসুমী, যাঁরা বন্ধুর এই অপমান এবং হত্যা মেনে নিতে পারেননি, তাঁরা সহ গোটা গ্রামের মানুষ শাসকের বৈরিতা, চোঙ রাঙানিকে যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি লড়াইয়ের ময়দানে বন্ধু হিসাবে যারা থেকেছেন, সাহস জুগিয়েছেন তাঁদেরও চিনেছেন। তাঁরা জেনেছেন বামপন্থীরাই বিপদের দিনের সাথী, ন্যায় বিচারের অধিকার সব মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের নিরলস সংগ্রামের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই বিপন্ন মানুষের দিকে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেন তাঁরা। সেই কথাই জেনেছে ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, সাত্তোর, কাকদ্বীপ, কাটোয়ার মানুষ।

তাই নারীর অধিকারের দাবিতে দিকে দিকে তাঁরা দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তৎপর। নারী অবমাননায় দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে থাকার কলঙ্ক অপনোদনের জন্য দুষ্কৃতীরাজকে পরাস্ত করতে তাঁরা আজ অঙ্গীকারবদ্ধ। কামদুনিসহ যেখানেই আক্রমণ, সেখানেই প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ গড়ে উঠছে। কামদুনির মানুষ দেখিয়ে দিয়েছেন অন্যায়ের কাছে নত হওয়া নয়, অশ্রুপাত নয়, বরং বুকের পাঁজর মশাল করে জ্বালিয়ে পথ চলতে হবে, যতক্ষণ না জয় আসে। □

গরিব মারা চিটফান্ড কেলেঙ্কারি

দেবাশীষ রায়

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনের পরে যে দুর্নীতি সব থেকে বেশি সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে স্থান পেয়েছে তা অবশ্যই সারদাসহ বিভিন্ন চিটফান্ডগুলির দুর্নীতির খবর। শুধু সারদা চিটফান্ডের এজেন্টদের আত্মহত্যা একটা সময় সংবাদ শিরোনামে থেকেছে। চিটফান্ডের বিরুদ্ধে বিগত সরকার ২০০৯ সালে একটি আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিধানসভায় বিল পাশ করলেও বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে তাকে ত্রুটিপূর্ণ আখ্যা দিয়ে বজ্রকঠিন আইন তৈরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তব এটাই বলছে এই পরিবর্তনের সুযোগে রাজ্যের গরিব মানুষের কয়েক হাজার কোটি টাকা আত্মস্মাৎ করেছে চিটফান্ড সংস্থাগুলি। ‘সারদা’ ও অন্যান্য চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে প্রতারিত হয়েছেন প্রায় এক কোটি মানুষ। বেশির ভাগই গরিব ও নিম্নবিত্ত। উধাও হয়ে গেছে ২৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। বিরোধীরা বলছেন শাসকদলের এমন পরিকল্পিত অপরাধ শুধু এ রাজ্যে নয়, সম্ভবত গোটা দেশে কেউ কখনও দেখেনি। সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়েছে শাসকদলের মন্ত্রী, সাংসদদের। শাসকদলের টিকিটে রাজ্যসভায় নির্বাচিত কুণাল ঘোষ সারদাকাণ্ডের সঙ্গে বর্তমান শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্বের যোগসাজশ নিয়ে প্রকাশ্যে বেশ কয়েকবার মুখ খোলায় প্রথমে তাকে দল থেকে সাসপেন্ড করে পরবর্তীতে ২০১৩ সালের ২৩ নভেম্বর জেলবন্দী করে বর্তমান রাজ্য সরকার, এখনও তিনি জেলে রয়েছেন। কুণাল ঘোষকে সাসপেন্ড করলেও বা জেলে পাঠালেও বিস্ফোরক মন্তব্য করা থেকে বিরত করতে পারেনি বর্তমান শাসকদল।

সারদাসহ বিভিন্ন চিটফান্ডগুলির বেআইনী কার্যকলাপের বিষয়গুলি প্রকাশ্যে আসার পর ২০১২ সালের ১০ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বামফ্রন্টের বিধায়কদের পক্ষ থেকে তদন্ত দাবি করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। তারপরের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে দারুণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সরকার পক্ষের বিধায়করা বামফ্রন্টের মহিলা বিধায়ক দেবলীনা হেমব্রমসহ কয়েকজনকে নির্দয়ভাবে নিগ্রহ করে। সিপিআই(এম) বিধায়ক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জীর চোয়ালে চিড় ধরে। কিন্তু এই আক্রমণের বিষয়টি প্রথমে পরিষ্কার না হলেও এপ্রিল মাসে যখন সারদার বিপর্যয় ঘটলো, দেখা গেল সারদার কর্ণধার সুদীপ্ত সেনের ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন শাসকদলের নেতা-মন্ত্রী-সাংসদরা, কেউ ব্যবসায় সঙ্গী, কেউ প্রত্যক্ষ মদতদাতা। রাজনৈতিক সুরক্ষার বিনিময়ে অর্থ—এই ছিল গোপন বোঝাপড়া। যেখানে প্রতারিত, সর্বস্বান্ত হয়েছে রাজ্যের ১৮ লক্ষের বেশি পরিবার সেখানে এই কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দিতে প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিল বর্তমান শাসকদল। বিচার বিভাগীয় কমিশন ও ‘বিশেষ’ পুলিশী তদন্ত দল (সিট) গঠনের আসল উদ্দেশ্য ছিল প্রতারকদের আড়াল করা। সে কারণেই সারদার সম্পত্তিতে হাত না দিয়ে সরকারী তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে বিরোধীরা দাবি করছেন। পরবর্তীতে কমিশন বন্ধ করে দেওয়া হয়। কমিশনের রিপোর্টও প্রকাশ করা হয়নি। সিবিআই যাতে এই তদন্তে যুক্ত না হয় তার জন্য সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী বর্তমান রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১১ কোটি টাকা খরচ করা হয় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মামলায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত শুরু হওয়ার পর ২০১৪ সালে ৯ সেপ্টেম্বর প্রাক্তন আইপিএস ও শাসকদলের তৎকালীন সহসভাপতি রজত মজুমদার গ্রেপ্তার হন। জামিন পান ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫। ২০১৪ সালের ২১ নভেম্বর গ্রেপ্তার হন শাসকদলের রাজ্যসভার সাংসদ সৃঞ্জয় বসু। তিনি ৪ ফেব্রুয়ারি (২০১৫) জামিন পান এবং তারপরই ‘রাজনীতি ছাড়ার সিদ্ধান্ত’ ঘোষণা করেন। এই গ্রেপ্তারির তালিকায় সবচেয়ে নজরকাড়া নাম রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্র। যাকে সিবিআই ২০১৪ সালের ১২ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করে। জেলবন্দী হওয়ার পরও দীর্ঘদিন তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন, কিছুদিন পূর্বে প্রভাবশালী তকমা ঘোচানোর জন্য তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি এখনও জেলে। মদন মিত্র জেলবন্দী হওয়ার পরই শাসকদলের সর্বোচ্চ স্তরের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মামলা চলাকালীন আদালতের কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়। এছাড়াও আরও ৫-৬ জন সাংসদ ও একাধিক মন্ত্রীকে সিবিআই জেরা করেছে। কালিম্পঙের ডেলোতে সরকারী অতিথিশালায় ২০১২ সালের মার্চে গভীর রাত্রে সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন ও রোজভ্যালির কর্তা গৌতম কুণ্ডুর সঙ্গে শাসক দলের সর্বোচ্চ নেত্রীর বৈঠকের কথা শাসকদলের রাজ্যসভার এক প্রভাবশালী সাংসদ যেমন প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন তেমনি গৌতম কুণ্ডু নিজেই কলকাতায় সাংবাদিকদের কাছে গত ৩ ফেব্রুয়ারি (২০১৫) এই বৈঠকের কথা মেনে নেন। শুধু সারদা বা রোজভ্যালি নয়, আরও বেশ কয়েকটি চিটফান্ডের প্রতারণা ব্যবসার সঙ্গেও শাসকদলের নেতাদের যোগসাজশ ইতিমধ্যেই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। অ্যালকেমিস্ট চিটফান্ডের মালিক হরিয়ানার ব্যবসায়ী ও শাসকদলের সাংসদ। বিভিন্ন সময়ে প্রতারণা সহ যে সমস্ত তথ্য সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে বা তদন্তে উঠে আসছে তা দেখে বিরোধীরা বলছেন সারদা আর শাসকদলের সততা আজ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। □

রাজ্যে চা-শিল্পে সঙ্কট

অশোক রায়

বাংলার চা-এর গোটা বিশ্বেই সমাদর। এমনকি বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা ভারতের কোষাগারে জমা করে। কিন্তু যারা এর মূল রূপকার তাদের অনাহারে, দারিদ্রে, অপুষ্টিতে মৃত্যুর মিছিল চলছে।

রাজ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে যে জায়গাকে সুইজারল্যান্ড বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা এখন সাক্ষাৎ মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে বিগত ৩-৪ বছরের মধ্যে।

ভারতে চা উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। ২৯০টি চা বাগানে ২.১৪ লক্ষ কর্মী কাজ করে এবং বছরে ২২১ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন করে। এই শিল্পে যুক্ত পরিবারসহ প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ। অবশ্য ছোট বড় মিলিয়ে মোট চা বাগান ৪৫০-র বেশি। গত ২ বছরে ৩৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বন্ধ আছে ৩৭টি চা বাগান।

চা বাগান আগেও বন্ধ হয়নি এমন নয়। ২০০৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির জন্যই ৩১টি চা বাগান বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তৎকালীন রাজ্য সরকার জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিয়ে এবং মালিকপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ৩০টি চা বাগানই পুনরায় খুলতে সমর্থ হয়। রেশন, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ সরকারী উদ্যোগে সহমর্মিতার পরিবেশে রক্ষার দায় গ্রহণ করে তৎকালীন সরকার।

বর্তমান বন্ধ ৩৭টি চা বাগান—বর্তমান সরকার রেশন নিয়ে কারসাজি, দলবাজি, বিদ্যুতের সংযোগ কেটে দেওয়া, জল সরবরাহে গাফিলতি দেখানোয় ইতিমধ্যেই মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। মৃতের সংখ্যা বর্তমানে ৫০০ ছাড়িয়েছে। প্রতিদিন সংখ্যাটা বাড়ছে। আর সরকার ডানকান গোষ্ঠীর ৩২টা চা বাগান অধিগ্রহণের যে প্রচার করেছিল (সংবাদপত্রেই প্রকাশিত) তার সত্যতা জানার জন্য লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে ৯ মার্চ ২০১৬ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন লিখিতভাবে জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকার গত ৩ মাসে পশ্চিমবঙ্গে কোনো চা বাগান অধিগ্রহণ করেনি।

অনাহারে মৃত্যুর বড় কারণ, চা শ্রমিকদের মজুরি পশ্চিমবঙ্গে ৯৫ থেকে ১২৬ টাকার মধ্যে। অথচ রেগা নিয়ম অনুযায়ী সর্বনিম্ন মজুরিই হলো ২০০ টাকা। বর্তমানে মালিকরা চা শ্রমিকদের অন্যান্য যে সুবিধা দিত তাও বন্ধ করেছে। রাজ্যের সরকার সরকারি প্রচারে শাসক দলের গুণকীর্তনে ব্যস্ত, প্রকৃত দায়িত্ব পালনে উৎসাহ নেই। বরং সেইসব জায়গায় শাসকদল বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সাথে মিলে ভোটের অঙ্ক কষতে ব্যস্ত।

তবে এই সমস্ত চা শ্রমিকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে গোটা দেশের দায়িত্বশীল গণসংগঠনগুলি মানুষকে রক্ষার শপথে গড়ে উঠেছে যৌথ আন্দোলন। একই সাথে নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীর সরবরাহ করে সহায়তার হাত বাড়িয়েছি আমরাও। আমরা কম্বুকণ্ঠে বলতে চাই এ রাজ্যের বুকে ঘটে চলা এই নির্মম আত্মহত্যার মিছিল বন্ধ করতে আমরা দায়বদ্ধ।

প্রায় ২০০টি চা কোম্পানির মুনাফার পরিমাণ কিন্তু কমেনি বরং বেড়েছে। ঐসব পুঁজি মালিকরা ব্যয়ের বৃহৎ অংশ বিজ্ঞাপনে খরচ করে, আর পেটে মারে শ্রমিকদের। এটা তাই শুধু আত্মহত্যায় নয়, এটাকে পরিকল্পিত হত্যালীলা বললেও অত্যুক্তি হবে না। আর এই হত্যালীলার কারবারীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশে আমাদের যেন কোনো সংশয় না থাকে। তবেই আমরা আগামীর রাজনৈতিক লড়াইয়ে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারবো। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
44th Year, 11th Issue, March 2016

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

আর এস এস, বিজেপির ফ্যাসিবাদী রূপ

মানস কুমার বড়ুয়া

সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে ব্যবহার

● গুজরাটে গণহত্যার পর ভোট আট মাস এগিয়ে এনেছিল বিজেপি সরকার। তীব্র মেরুকরণ, বিভাজন আর হিংসার আবহে ২০০২ সালের বিধানসভা ভোটে গরিষ্ঠতা নিশ্চিত করেছিল বিজেপি। নেতৃত্বে ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। বিজেপির আসন বেড়েছিল ৪৫টি।

● ২০১৩ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে মুজফ্ফরনগরকে কেন্দ্র করে উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমভাগ জুড়ে শুরু হয় গভীর ষড়যন্ত্র। ইভটিজিং ও শ্লীলতাহানির মতো ঘটনাকে ধর্মীয় বিভাজনের রঙ লাগিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়। বিজেপির বিধায়করা সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে এই হিংসার। ৬০ জনের বেশি মানুষ খুন হলেন। লক্ষাধিক মানুষ ঘরছাড়া হলেন। মহিলাদের উপর ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানি চলল গণহারে। বিজেপি নেতা অমিত শাহ সাম্প্রদায়িক প্ররোচনামূলক বক্তব্য রাখেন। তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে নির্বাচন কমিশন। এই বিভাজনই লোকসভা ভোটের মেশিনে বিপুল ফায়দা দেয় বিজেপিকে। উত্তরপ্রদেশের ৮০টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৭৩টি জেতে বিজেপি-জোট।

● দিল্লী বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে মেরুকরণের খেলা শুরু হয় খোদ রাজধানীতেও। ২০১৪ সালে দীপাবলির পরে পরেই সাম্প্রদায়িক হিংসা শুরু হয় ত্রিলোকপুরীতে। অতীতে কখনও এই এলাকায় এরকমটা ঘটেনি। শুরু হয় খ্রীস্টান উপাসনালয়ের উপর হামলা। ১ ডিসেম্বর দিল্লীর সেবেজিয়ান গির্জা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযুক্তদের না ধরে পরোক্ষে হিংসায় মদত দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। দিল্লীর ধাওরানা ও নন্দাগিরিতেও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর অভিযোগ ওঠে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে। সুখের কথা দিল্লীতে এই কৌশল ওদের কাজে আসেনি। দিল্লী বিধানসভা ভোটে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয় বিজেপি।

অসহিষ্ণুতা

● উত্তরপ্রদেশের কামরির বিসারা গ্রামে মহম্মদ আখলাকের ঘরের ফ্রিজে গো-মাংস আছে এই গুজব পরিকল্পিত ভাবে রটিয়ে উত্তেজনা তৈরি করা হয়। পরিবারের সকলেই জানায় যে ওটা গোরুর মাংস নয়, পাঠার মাংস। সে সব তোয়াক্কা না করে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক মহম্মদ আখলাককে ঘর থেকে টেনে হিঁচড়ে বার করে লাঠি, রড দিয়ে পিটিয়ে থেঁতলে খুন করে উন্মত্ত দুষ্কৃতীরা। যাদের অধিকাংশই তাঁর প্রতিবেশী। বাবাকে বাঁচাতে এসে গুরুতর জখম হন আখলাকের ছেলে দানিশ। মৃত্যুর সঙ্গে দীর্ঘদিন লড়াই করে সে ফিরে এসেছে। আখলাকের বুড়িমাকেও মারধর করা হয়। শ্লীলতাহানি করা হয় তাঁর মেয়েকে। এই ঘটনাকে পরবর্তীকালে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ব্যবহার করা হয়। বিজেপি সরাসরি বিহারের ভোটে গোরুর মাংস নিয়ে প্রচারে নামে। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। গোরুর ছবি দিয়ে সংবাদপত্রে প্ররোচনামূলক বিজ্ঞাপন দেয় বিজেপি। ধর্মের নামে মেরুকরণই ছিল এর লক্ষ্য। যদিও বিহারের মানুষ নির্বাচনে বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। গোমাংস-খাওয়া বা বিক্রি করার বিষয়কে কেন্দ্র করে আরও অনেক ঘটনা হিন্দুত্ববাদীরা ঘটিয়েছে। সম্প্রতি ছত্তিশগড়ে দুইজন খুন হয়েছেন—গরু পাচারের মিথ্যা অপবাদে।

মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে অপপ্রচার ঃ

● সংঘ পরিবার এই প্রচার নিয়মিত করে যে জনসংখ্যায় হিন্দুদের অংশ কমছে। ভারসাম্য রক্ষার জন্য হিন্দু নারীদের বেশি করে সন্তানের জন্ম দেওয়া উচিত। সাম্প্রতিক জনগণনার তথ্য বলছে মুসলিমদের মধ্যে গত এক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে। ২০০১-এ হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২০.৩ ও ২৯.৫ শতাংশ। ২০১১-তে এই হার দাঁড়িয়েছে ১৬.৮ ও ২৪.৬ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে হিন্দুদের যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে ৩.৫ শতাংশ, মুসলিমদের ক্ষেত্রে এই হার হ্রাস পেয়েছে ৪.৯ শতাংশ।

লাভ জিহাদ

● কেরালা এবং কর্ণাটকে ২০০৯ সাল নাগাদ উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'হিন্দু জনজাগৃতি সমিতি' প্রথম 'লাভ জিহাদ' শব্দটি আমদানি করে। মূল কথা মুসলিম যুবকরা হিন্দু মেয়েদের ভালোবাসার নামে ফাঁসিয়ে ধর্মান্তরিত করছে। মুসলিম সংগঠনগুলি নাকি পরিকল্পিত ভাবে এ কাজ করছে। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কাজের কায়দায় তারা এ জন্য সুদর্শন মুসলিম যুবকদের কাজে লাগাচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়। প্রলুব্ধ করে হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করা হয় নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী। এরপর 'ধর্মান্তরিত করা হয়। রাজি না হলে যৌন হেনস্তা, ধর্ষণ করা হয়। সংঘ পরিবার এমন প্রচারও চালায় যে এর জন্য নাকি বিদেশ থেকে টাকা আসছে। ২০০৯ সালে কেরালা এবং কর্ণাটক সরকার 'লাভ জিহাদ' অভিযোগ নিয়ে তদন্ত চালিয়ে দেখেছিল যে অভিযোগ ভিত্তিহীন। উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগরে লোকসভা ভোটের আগে উত্তেজনা তৈরির সময় বিজেপি নেতা সঞ্জীব সোম, সঞ্জয় বালিয়ানদের দিয়ে লাভ জিহাদের প্রচার চালায়। স্লোগান তোলা হয়েছিল, 'বেটি বাঁচাও, বহু বানাও'। হাস্যকর বিষয় হল বিজেপির মুসলিম মুখ শাহনাওয়াজ হুসেইন এবং মুক্তার আব্বাস নকভির স্ত্রী কিন্তু হিন্দু পরিবারের। এরকম আরও উদাহরণ আছে।

ঘর ওয়াপসি

● 'ঘর ওয়াপসি' মানে হল ঘরে ফেরা। সংঘ পরিবারের বক্তব্য ভারতের মুসলমানরা সবই হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত, সুতরাং তাদের হিন্দু ধর্মে নিয়ে আসা মানেই ঘরে ফেরা বা ঘর ওয়াপসি। জোর জবরদস্তি বা প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তকরণের এই প্রয়াসের নাম 'ঘর ওয়াপসি'-এর জন্য সংঘ অনুগামীরা বিভিন্ন ধরনের সংগঠন গঠন করে। আগ্রার বেদনগরে এমনই এক অনুষ্ঠানের যোগ ছিল 'ধরম জাগরণ সমিতি'। এই সমিতির নেতা রাজেশ্বর সিং সোলাঙ্কির কথায়, 'আমাদের উদ্দেশ্য হল ভারতে খাটি ও সৃজনশীল সমাজ গড়ে তোলা। ২০২১ সালের মধ্যে নিশ্চিত করা যাতে দেশে কোনো খ্রীস্টান এবং মুসলিম না থাকে।'' তিনি আরো জানিয়েছিলেন যে মুসলিম এবং খ্রীস্টানদের দেশের বাইরে পাঠাতে বলা হচ্ছে না। তবে সোলাঙ্কি বলছেন, ''তাদেরও বুঝতে হবে যে তারা সকলেই আদতে ছিলেন হিন্দু। সেই কথা মনে রেখে তাঁদের হিন্দু জীবনবোধ ও জীবনচর্চা মেনে চলতে হবে (ফ্রন্টলাইন-৯/১/২০১৫)।

ইতিহাস, নৃতত্ত্বের কোনো প্রমাণ নেই। মুখের কথাই যথেষ্ট সংঘের প্রচারে।

যুক্তিবাদী বিশ্বাস মনস্কদের হত্যা

● ড. এম এম কালবুর্গি ঃ সাহিত্যের গবেষক এবং সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ডক্টর কালবুর্গি' ২০১৪ সালে কুসংস্কার বিরোধী বিলের পক্ষে আয়োজিত একটি সেমিনারে ইভ আর অনন্ত মূর্তির ওই 'বেথালে পুজ্যে ইয়াকে কুড়াড়ু' পড়ে শোনান। নিজের শৈশবের কিছু উদাহরণ দেন। যার ফলে উন্মত্ত হয়ে ওঠে ইতিমধ্যেই তাঁর যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা হিন্দুত্ববাদী দলগুলি। সকালে নিজের ঘরেই আততায়ীর গুলিতে খুন হয়ে যান এই বিশিষ্ট ব্যক্তি। কালবুর্গির হত্যার আনন্দে বজরঙ্গ দলের যৌথ আহ্বায়ক জুবিথ শেঠী ট্যুইট করেন, ''তখন ছিল ইউ আর অনন্দমূর্তি এবার এম এম কালবুর্গি। হিন্দুত্বকে নিয়ে তামাশা এবং একটি কুকুরের মৃত্যু...''। তবু এখনও অধরা দোষীরা।

● গোবিন্দ পানসারে ঃ বিশিষ্ট লেখক যুক্তিবাদী পানসারে মোট ২১টি বই লিখলেও, ১৯৮৮ সালে তাঁর লেখা 'শিবাজী কৌন হোতা' আলোড়ন তৈরি করে। মোট ৩৮টি সংস্করণে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার বই ছাপা হয়। হিন্দি, ইংরেজি, গুজরাটি ছাড়াও উর্দু এবং কন্নড়ে এই বই ছাপা হয়। এই বইয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন ধর্মের বিচার মাথায় রেখে শাসন পরিচালনা করেননি শিবাজী। উগ্র হিন্দুত্বাবদীরা ক্ষেপে ছিল। পরোয়া করেননি পানসারে। এছাড়াও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ প্রদানের অনুষ্ঠানও তাঁর সংগঠনের উদ্যোগে করা হত। সবকিছুই অসহ্য ছিল হিন্দুত্বাবাদীদের। মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে স্ত্রীর সাথে প্রাতঃভ্রমণ করে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় তাঁর দেহ। পাঁচদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর প্রাণ হারান তিনি।

● নরেন্দ্র দাভোলকর ঃ পেশায়

● *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)*

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন-এর জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

বিজয় কুমার সিংহ

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ৫-৬ মার্চ, ২০১৬ রাজস্থানের জয়পুরে রাজস্থান এগ্রিকালচার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের বিশাল ক্যাম্পাসের সুদৃশ্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি কনফারেন্স হলে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। অল রাজস্থান স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশন এই সভা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব পালন করেন। সভার দু'দিন রাজস্থান সংগঠনের সার্বিকভাবে আপ্যায়ন ও অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা রাজ্যগুলি থেকে আসা কার্যনির্বাহী সদস্যদের দারুণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে।

প্রথম দিন ৫ মার্চ, ২০১৬ জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সভার প্রারম্ভে চেয়ারম্যান আর মুথুসুন্দরম সাম্প্রতিককালে প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ শহীদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন এবং ২ মিনিট নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এরপর সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ভাইস-চেয়ারম্যান তথা রাজস্থান সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতা ওমপ্রকাশ শর্মা সভায় উপস্থিত কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্যদের অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। পরে সারা ভারত ও রাজস্থান সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব উদয় সিং রাঠোরকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তিনি রাজস্থান কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতির উপর বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন।

সভায় মূলপর্বের শুরুতে সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার প্রতিবেদন পেশ করেন। বর্তমান জাতীয় আন্তর্জাতিক ও স্ব-স্ব রাজ্যের পরিস্থিতির উপর ব্যাখ্যা করে বলেন সারা বিশ্বে ২০০৮ সালের পুঁজির মন্দা এখনও বিরাজমান। শুধু তাই না, মন্দা এখন বিশ্বে স্থায়ী রূপ নিয়েছে। সারা বিশ্বে এখনও এই মন্দা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তার প্রতিফলন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমজীবী মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া জারি রেখেছে। যা শ্রমিক কর্মচারী তথা শ্রমজীবী মানুষ মেনে নিচ্ছে না। ফলে বিশ্ব জুড়ে তীব্র লড়াই আন্দোলনও হচ্ছে। কোনো সুরাহা হচ্ছে না বলে দেশে দেশে সাধারণ মানুষ ধর্মঘটে শামিল হচ্ছে।

দেশের বিজেপি সরকার নয়া উদারনীতির পথ ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে গতি বৃদ্ধি করে আরও নির্মমভাবে স্বৈরাচারের সাথে তা প্রয়োগ করছে। আমাদের দেশেও পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে ও বাইরে শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনও তীব্র হচ্ছে। ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ ধর্মঘটে ব্যাপক সাফল্য এসেছে।

শ্রমিক কর্মচারী সাধারণ মানুষের ঐক্যকে ভাঙার লক্ষ্যে আর এস এস-বিজেপি দেশে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে ও দাঙ্গা বাধিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদের প্রক্রিয়া জারি রেখেছে। দেশে জে এন ইউ-র ঘটনাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তারই ভয়াবহ সর্বনাশা উদাহরণ। শিক্ষাঙ্গনে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়ে দিতে চাইছে। দেশের সাধারণ মানুষের ঐক্যকে ভেঙে দেওয়াই একমাত্র লক্ষ্য। সম্প্রতি বিজেপি সরকার রেল ও সাধারণ বাজেটে বেসরকারীকরণের পদক্ষেপসহ দেশী বিদেশী কর্পোরেটদের ও বড়লোকদের স্বার্থই রক্ষা করেছে। আর পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করে দেশের সাধারণ মানুষের উপর বোঝা চাপিয়েছে। আগামী দিনে বিজেপি সরকারের জনবিরোধী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। নিউ পেনশন স্কীম ও ৭ম বেতন কমিশনে কর্মচারী বিরোধী সুপারিশের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন কর্মসূচীর বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ৫ম জাতীয় মহিলা কনভেনশন ও শিক্ষা শিবির সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তামিলনাড়ু সরকারী কর্মচারীদের ধারাবাহিক ধর্মঘটের সাফল্যের দিকগুলি উল্লেখ করে অভিনন্দন জানান। এই প্রথম দিল্লীর যন্তরমন্তরে ৭ম পে-কমিশনের কর্মচারী বিরোধী সুপারিশের বিরুদ্ধে দশ দিন ধরনার কর্মসূচী সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে মেমোরান্ডাম দেওয়া হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। (উল্লেখ করা যেতে পারে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক মনোজকান্তি গুহ, যুগ্ম সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্যসহ ১৫ জন প্রতিনিধি এই ধরনা কর্মসূচীতে শামিল হয়েছিলেন)। এছাড়াও আশু দাবি দাওয়া ও অন্যান্য সাংগঠনিক কর্মসূচীর বিষয়গুলি প্রস্তাবাকারে সভায় রাখা হয়।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার উপর ও মহিলা সেসনে ১২ জন মহিলাসহ ৩৩ জন সদস্য প্রতিনিধি সভায় স্ব স্ব রাজ্যের পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেন। আমাদের রাজ্য থেকে অন্যতম সহ-সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ ও সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শিখা মুখার্জী অলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কার্যনির্বাহী সদস্যদের পরিস্থিতির উপর গঠনমূলক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার উপর জবাবী বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার। শেষে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে সংগঠনের চেয়ারম্যান আর মুথুসুন্দরম আগামী দিনের করণীয় সম্পর্কে সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

(১) বিগত জাতীয় সম্মেলন থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠন তহবিল যেসব রাজ্য এখনও দেয়নি অতি সত্বর জমা দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

(২) আগামী ৪ এপ্রিল, ২০১৬ ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল ফর পাবলিক সার্ভিসেস-র উদ্যোগে 'অ্যান্টি প্রাইভেটাইজেশন' দিবস হিসাবে রাজ্যে রাজ্যে কর্মসূচী পালন করতে হবে।

(৩) আগামী ৪-৫ জুন, ২০১৬ বিহারের পাটনায় শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।

(৪) নিউ পেনশন স্কীম ও ৭ম বেতন কমিশনে কর্মচারী বিরোধী সুপারিশগুলির বিরুদ্ধে রাজ্যে রাজ্যে ব্লক লেভেল পর্যন্ত বিক্ষোভ জমায়েতের কর্মসূচী হবে। ৩০ মার্চ ২০১৬ নিউ দিল্লীতে জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে।

(৫) পরবর্তী জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আগামী ১৮-১৯ জুন, ২০১৬ পশ্চিমবঙ্গে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়া সভায় গুরুত্ব দিয়ে এমপ্লয়িজ ফোরাম-এর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া, রাজ্যে রাজ্যে কর্মচারীদের মধ্যে সঠিক সময়ে বিলি বণ্টন করা এবং পাঠকে পরিণত করার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পত্রিকা গ্রাহকের বকেয়া জমা দেওয়ার উদ্যোগসহ সাংগঠনিক তহবিল ও অন্যান্য বকেয়া দ্রুততার সাথে গুটিয়ে আনার দায়িত্ব গ্রহণ করার আহ্বান রাখা হয়। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।